পাতাবাহার

বাংলা । চতুর্থ শ্রেণি

বিদ্যালয় শিক্ষা-দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ
ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

বিদ্যালয় শিক্ষা-দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

ডি কে ৭/১, বিধাননগর, সেক্টর -২
কলকাতা - ৭০০ ০৯১

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৪
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৫
চতুর্থ সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
পঞ্চম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী চতুর্থ শ্রেণির বাংলা বই প্রকাশিত হলো। মুখ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' তৈরি করেন। এই কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলিকে সমীক্ষা এবং পুনর্বিবেচনা করার। সেই কমিটির সুপারিশ মেনে বইটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯-এই নথিদুটিকে অনুসরণ করে নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মাণ করা হয়েছে। সেই কারণেই প্রতিটি বই একটি বিশেষ ভাবমূল (Theme)-কে কেন্দ্রে রেখে বিন্যস্ত করা হলো। প্রথাগত অনুশীলনীর বদলে হাতে কলমে কাজ (Activity)-এর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বইটিকে শিশুকেন্দ্রিক এবং মনোগ্রাহী করে তুলতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ বইটি প্রস্তুত করতে প্রভূত শ্রম অর্পণ করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

বইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে বইটি কীভাবে শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করতে হবে সেবিষয়ে সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার সমস্ত পাঠ্যবই প্রকাশ করে সরকার-অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যে বিতরণ করে। এই প্রকল্প রূপায়ণে নানাভাবে সহায়তা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন। বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী মানুষের মতামত আর পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৭

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন
ডি-কে ৭/১, সেক্টর ২
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

মানিক ভট্টাচার্য
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছি।

প্রতিটি শ্রেণির 'বাংলা' বইয়েরই কেন্দ্রে রয়েছে একটি বিশেষ ভাবমূল (Theme)। চতুর্থ শ্রেণির 'বাংলা' বইয়ের কেন্দ্রীয় ভাবমূল 'রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ও খেলার জগৎ'। বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষায় সামর্থ্য অর্জনের দিকটিকে যেমন আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিতে চেয়েছি, তার সঙ্গে কৃত্যালি-নির্ভর অনুশীলন, সংগীত, ছবি আঁকা, অভিনয়, হাতের কাজ প্রভৃতি আনন্দময় উপকরণকেও সংযোজিত করা হয়েছে। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, '...বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। ... আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে ফললাভ করে।' আমরা এই বক্তব্যকে মান্য করে বইটি প্রস্তুত করেছি।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন,পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভৃত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রাথমিক স্তরের বাংলা বইগুলি 'পাতাবাহার' পর্যায়ের অন্তর্গত। 'পাতাবাহার চতুর্থ শ্রেণি' বইটির শেষাংশে শিখন পরামর্শ সংযোজিত হলো। বইটি শিক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর, ২০১৭

নিবেদিতা ভবন
পঞ্চমতল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০০৯১

অভীক মজুমদার
চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

রত্না চক্রবর্তী বাগচী (সচিব, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ)

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু

অপূর্ব সাহা স্বাতী চক্রবর্তী ইলোরা ঘোষ মির্জা

সহযোগিতা

মণিকণা মুখোপাধ্যায় দেবযানী দাস দেবলীনা ভট্টাচার্য মৃণাল মণ্ডল

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল দীপ্তেন্দু বিশ্বাস অনুপম দত্ত পিনাকী দে

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

হিরণ লাইব্রেরি

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা

জেলা গ্রন্থাগার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

বিদ্যাসাগর পত্রপত্রিকা সংগ্রহশালা, রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবন

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

সবার আমি ছাত্র

সুনির্মল বসু

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
উদার হতে ভাইরে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
বায়ুর কাছে পাইরে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন মহান,
খোলা মাঠের উপদেশে
দিলখোলা হই তাইরে।

সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয়
আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখাল হাসতে মিঠে,
মধুর কথা বলতে।
ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর,
অন্তর হোক রত্নআকর ;
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম
আপন বেগে চলতে।

মাটির কাছে সহিষ্ণুতা
পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হতে
পাষাণ দিল দীক্ষা।
ঝরনা তাহার সহজ গানে
গান জাগাল আমার প্রাণে,
শ্যামবনানী সরসতা
আমায় দিল ভিক্ষা।

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র,
নানান ভাবের নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়
পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়
শিখছি সে সব কৌতূহলে
সন্দেহ নাই মাত্র।

হাতেকলমে

সুনির্মল বসু (১৯০২—১৯৫৭) : বিহারের গিরিডিতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রধানত ছোটোদের জন্য তিনি ছড়া, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি লিখেছেন। ছবি আঁকাতেও তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। তাঁর লেখা বইগুলি হলো — *ছানাবড়া, ছন্দের টুংটাং, বীর শিকারি, বেড়ে মজা, হইচই, কথাশেখা* ইত্যাদি। তিনি ১৯৫৬ সালে ‘ভুবনেশ্বরী পদক’ পেয়েছিলেন।

১. সুনির্মল বসুর লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

২. তিনি ১৯৫৬ সালে কী পদক পেয়েছিলেন?

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :**

৩.১ কার উপদেশে কবি দিলখোলা হন?

৩.২ পাষাণ কবিকে কী শিক্ষা দিয়েছিল?

৩.৩ কবি কার কাছ থেকে কী ভিক্ষা পেলেন?

৩.৪ কে কবিকে মধুর কথা বলতে শেখাল?

৩.৫ নদীর কাছ থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায়?

৪. **সন্ধি করে লেখো :**

রত্ন + আকর =　　মেঘ + আলোক =　　কমলা + আসনা =

৫. **সমার্থক শব্দ লেখো :**

চাঁদ, সূর্য, পাহাড়, বায়ু, নদী, পৃথিবী, সাগর

শব্দার্থ : কর্মী --- কাজে দক্ষ। মৌন --- নীরব। দিলখোলা --- উদারমনা। মন্ত্রণা --- পরামর্শ। ইঙ্গিত --- ইশারা। রত্নআকর --- রত্নের খনি, সমুদ্র। সহিষ্ণুতা --- ধৈর্য, সহ্যক্ষমতা। পাষাণ — পাথর। দীক্ষা — মন্ত্রগ্রহণ। শ্যামবনানী — সবুজ অরণ্য। পাঠ্য — পাঠের উপযোগী।

৬. **বাক্যরচনা করো :**

উদার, মহান, মন্ত্রণা, শিক্ষা, সহিষ্ণুতা, সন্দেহ, কৌতূহল, ঝরনা।

৭. **নীচের বিশেষণ শব্দগুলির বিশেষ্য রূপ লেখো :**

কর্মী, মৌন, মধুর, কঠোর, বিরাট।

৮. **নীচের বিশেষ্য শব্দগুলির বিশেষণ রূপ লেখো :**

শিক্ষা, মন্ত্র, বায়ু, মাঠ, তেজ।

৯. **কবিতা থেকে সর্বনাম শব্দগুলি খুঁজে নিয়ে লেখো:** (অন্তত ৫ টি)

১০. **গদ্যরূপ লেখো :**

১০.১ 'কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাইরে।'

১০.২ 'সূর্য আমায় মন্ত্রণা দেয় আপন তেজে জ্বলতে।'

১০.৩ 'ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর, অন্তর হোক রত্নআকর ;'

১০.৪ 'শ্যামবনানী সরসতা আমায় দিল ভিক্ষা।'

১০.৫ 'শিখছি সে সব কৌতূহলে সন্দেহ নাই মাত্র।'

১১. 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা' বলতে কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?

১২. **প্রকৃতির কার কাছ থেকে আমরা কীরূপ শিক্ষা পেতে পারি লেখো :**

১ আকাশ	
২ বাতাস	
৩ পাহাড়	
৪ খোলামাঠ	
৫ সূর্য	
৬ চাঁদ	

১৩. প্রকৃতির আরও কিছু উপাদানের কথা তুমি লেখো আর তাদের থেকে কী শিক্ষা তুমি নিতে পারো তা উল্লেখ করো।

১৪. **এমন একজন মানুষের কথা লেখো যার কাছ থেকে অহরহ তুমি অনেক কিছু শেখো :**

____

____

____

____

______________________________ ।

নরহরি দাস

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

যেখানে মাঠের পাশে বন আছে, আর বনের ধারে মস্ত পাহাড় আছে, সেইখানের একটা গর্তের ভিতরে একটা ছাগলছানা থাকত। সে তখনও বড়ো হয়নি, তাই গর্তের বাইরে যেতে পেত না। বাইরে যেতে চাইলে তার মা বলত, 'যাসনে! ভালুকে ধরবে, বাঘে নিয়ে যাবে, সিংহে খেয়ে ফেলবে!' তা শুনে তার ভয় হতো, আর সে চুপ করে গর্তের ভিতরে বসে থাকত। তারপর সে একটু বড়ো হলো, তার ভয়ও কমে গেল। তখন তার মা বাইরে চলে গেলেই সে গর্তের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখত। শেষে একদিন একেবারে গর্তের বাইরে চলে এল।

সেইখানে এক মস্ত ষাঁড় ঘাস খাচ্ছিল। ছাগলছানা আর এত বড়ো জন্তু কখনও দেখেনি। কিন্তু তার শিং দেখেই সে মনে করে নিল, ওটাও ছাগল, খুব ভালো জিনিস খেয়ে এত বড়ো হয়েছে। তাই সে ষাঁড়ের কাছে গিয়ে জিগগেস করল, 'হ্যাঁগা, তুমি কী খাও?'

ষাঁড় বললে, ‘আমি ঘাস খাই।’

ছাগলছানা বললে, ‘ঘাস তো আমার মাও খায় সে তো তোমার মতো এত বড়ো হয়নি।’

ষাঁড় বললে, ‘আমি তোমার মায়ের চেয়ে ঢের ভালো ঘাস অনেক বেশি করে খাই।’

ছাগলছানা বললে, ‘সে ঘাস কোথায়?’

ষাঁড় বললে, ‘ওই বনের ভিতরে।’

ছাগলছানা বললে, ‘আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে।’ একথা শুনে ষাঁড় তাকে নিয়ে গেল।

সেই বনের ভিতরে খুব চমৎকার ঘাস ছিল। ছাগলছানার পেটে যত ঘাস ধরল, সে তত ঘাস খেল।

খেয়ে তার পেট এমন ভারী হলো যে, সে আর চলতে পারে না।

সন্ধে হলে ষাঁড় এসে বলল, ‘এখন চলো বাড়ি যাই।’

কিন্তু ছাগলছানা কী করে বাড়ি যাবে? সে চলতেই পারে না।

তাই সে বললে, ‘তুমি যাও, আমি কাল যাব।’

তখন ষাঁড় চলে গেল। ছাগলছানা একটি গর্ত দেখতে পেয়ে তার ভিতরে ঢুকে রইল।

সেই গর্তটা ছিল এক শিয়ালের। সে তার মামা বাঘের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। অনেক রাত্রে ফিরে এসে দেখে, তার গর্তের ভিতর কীরকম একটা জন্তু ঢুকে রয়েছে। ছাগলছানাটা কালো ছিল, তাই শিয়াল অন্ধকারের ভিতর ভালো করে দেখতে পেল না। সে ভাবল বুঝি রাক্ষস-টাক্ষস হবে।

এটা মনে করে সে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করল, ‘গর্তের ভিতর কে ও?’

ছাগলছানাটা ভারি বুদ্ধিমান ছিল, সে বললে —

লম্বা লম্বা দাড়ি

ঘন ঘন নাড়ি।

সিংহের মামা আমি নরহরি দাস

পঞ্চাশ বাঘে মোর এক-এক গ্রাস!

শুনেই তো শিয়াল ‘বাবা গো!’ বলে সেখান থেকে দে ছুট! এমন ছুট দিল যে একেবারে বাঘের

ওখানে গিয়ে তবে সে নিশ্বাস ফেললে।

বাঘ তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কী ভাগনে, এই গেলে, আবার এখুনি এত ব্যস্ত হয়ে ফিরলে যে?'

শিয়াল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'মামা, সর্বনাশ তো হয়েছে, আমার গর্তে এক নরহরি দাস এসেছে। সে বলে কিনা যে পঞ্চাশ বাঘে তার এক গ্রাস!'

তা শুনে বাঘ ভয়ানক রেগে বললে, 'বটে, তার এত বড়ো আস্পর্ধা! চলো তো ভাগ্নে! তাকে দেখাব কেমন পঞ্চাশ বাঘ তার এক গ্রাস!'

শিয়াল বললে, 'আমি আর সেখানে যেতে পারব না, আমি সেখানে গেলে যদি সেটা হাঁ করে আমাদের খেতে আসে, তাহলে তুমি তো দুই লাফেই পালাবে। আমি তো তেমন ছুটতে পারব না, আর সে বেটা আমাকেই ধরে খাবে।'

বাঘ বললে, 'তাও কী হয়? আমি কখনও তোমাকে ফেলে পালাব না।'

শিয়াল বললে, 'তবে আমাকে তোমার লেজের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে চলো।'

তখন বাঘ তো শিয়ালকে বেশ করে লেজের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে, আর শিয়াল ভাবছে, ‘এবারে আর বাঘমামা আমাকে ফেলে পালাতে পারবে না।

এমনি করে তারা দুজনে শিয়ালের গর্তের কাছে এল। ছাগলছানা দূর থেকেই তাদের দেখতে পেয়ে শিয়ালকে বললে —

দূর হতভাগা! তোকে দিলুম দশ বাঘের কড়ি
এক বাঘ নিয়ে এলি লেজে দিয়ে দড়ি!

শুনেই তো ভয়ে বাঘের প্রাণ উড়ে গিয়েছে। সে ভাবলে যে, নিশ্চয় শিয়াল তাকে ফাঁকি দিয়ে নরহরি দাসকে খেতে দেওয়ার জন্য এনেছে। তারপর সে কী আর সেখানে দাঁড়ায়! সে পঁচিশ হাত লম্বা এক-এক লাফ দিয়ে শিয়ালকে সুদ্ধ নিয়ে পালাল। শিয়াল বেচারা মাটিতে আছাড় খেয়ে, কাঁটার আঁচড় খেয়ে, ক্ষেতের আলে ঠোক্কর খেয়ে একেবারে যায় আর কী! শিয়াল চেঁচিয়ে বললে, ‘মামা, আল মামা আল!’ তা শুনে বাঘ ভাবে বুঝি সেই নরহরি দাস এল, তাই সে আরও বেশি করে ছোটে।

এমনি করে সারারাত ছুটোছুটি করে সারা হলো। সকালে ছাগলছানা বাড়ি ফিরে এল। শিয়ালের সেদিন ভারি সাজা হয়েছিল। সেই থেকে বাঘের উপর তার এমনি রাগ হলো যে, সে রাগ আর কিছুতেই গেল না।

হাতে কলমে

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩—১৯১৫) : বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক। *টুনটুনির বই, গুপী গাইন বাঘা বাইন, ছেলেদের রামায়ণ* ও *ছেলেদের মহাভারত* তাঁর লেখা জনপ্রিয় কয়েকটি বই। ১৯১৩ সালে ছোটোদের জন্য তিনি *সন্দেশ* পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি তিনি নিজের হাতে আঁকতেন। বাংলায় আধুনিক মুদ্রণশিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ বলা যায় তাঁকে। প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় তাঁর সুযোগ্য পুত্র।

১. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা তোমার প্রিয় একটি বইয়ের নাম লেখো।

২. তাঁর লেখা গল্প অবলম্বনে তৈরি কোন সিনেমা তুমি দেখেছ?

৩. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৩.১ 'হ্যাঁগা, তুমি কী খাও?' — ছাগলছানা ষাঁড়কে কী ভেবে এমন প্রশ্ন করেছিল?

৩.২ গল্পে বাঘ হলো শিয়ালের মামা, আর 'নরহরি দাস' নিজেকে কার মামা দাবি করল?

৩.৩ ছাগলছানা ষাঁড়ের সঙ্গে কেন বনে গিয়েছিল?

৩.৪ ছাগলছানা সেদিন রাতে কেন বাড়ি ফিরতে পারেনি?

৩.৫ অন্ধকারে শিয়াল ছাগলছানাকে কী মনে করেছিল?

৩.৬ বাঘ শিয়ালকে ফিরতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল কেন?

৩.৭ শিয়াল কোন্ শর্তে বাঘের সঙ্গে ফিরতে চেয়েছিল?

৩.৮ ছাগলের বুদ্ধির কাছে বাঘ কীভাবে হার মানল?

৪. **নীচের এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :**

য়া ন ভ ক, শ র্ব স না, ত রা রা সা, র ন্ধ অ কা, ম ণ নি ন্ত্র, না গ ল ছা ছা

৫. **নিজের ভাষায় বাক্য সম্পূর্ণ করো :**

৫.১ যেখানে মাঠের পাশে বন আছে _______।

৫.২ সেই বনের ভিতরে _______।

৫.৩ ছাগলছানাটা _______।

৫.৪ বাঘ শিয়ালকে _______।

৫.৫ বাঘ ভাবে _______।

৬. **একই অর্থের শব্দ পাশের শব্দঝুড়ি থেকে খুঁজে নিয়ে পাশাপাশি লেখো :**

বন, ছাগল, আশ্চর্য, সাজা, তৃণ

শব্দঝুড়ি
অবাক, ঘাস,
অজ, শাস্তি, জঙ্গল

৭. **বর্ণ বিশ্লেষণ করে নীচের ফাঁকা ঘরগুলি ভর্তি করো :**

শব্দ							
পাহাড়	প্	+ আ	+ হ্	+	+		
মস্ত		+ অ	+ স্	+	+ অ		
সন্ধে	স্	+ অ	+ ন্	+	+		
অন্ধকার	অ	+ ন্	+	+ অ	+ ক্	+	+
পঞ্চাশ		+ অ	+	+ চ্	+ আ	+ শ্	
আস্পর্ধা	আ	+	+ প্	+	+	+ ধ্	+ আ
ব্যস্ত		+	+ অ	+ স্	+ ত্	+ অ	
নিশ্বাস	ন্	+ ই	+	+	+	+ স্	

৮. **নীচের কথাগুলির মধ্যে কোন্‌টি বাক্য কোন্‌টি বাক্য নয় চিহ্নিত করো :**

(বাক্য হলে '✓' চিহ্ন দাও। বাক্য না হলে '×' চিহ্ন দিয়ে শুদ্ধ করে লেখো)

মাঠের পাশেই বন	
তাও কি হয়	
নরহরি দাস এসে	
আমি সেখানে গেলে	
ছাগলছানা বাড়ি ফিরে এল	

৯. **এলোমেলো শব্দগুলিকে সাজিয়ে বাক্য তৈরি করো :**

৯.১ গর্তের থাকত একটা ভিতরে ছাগলছানা

৯.২ কড়ি বাঘের দশ দিলুম তোকে

৯.৩ কিছুতেই আর গেল রাগ সে না

৯.৪ লাফেই দুই তুমি তাহলে পালাবে তো

৯.৫ সারারাত সারা করে ছুটোছুটি এমনি করে এল

১০. বাক্যরচনা করো :

মস্ত, জন্তু, চমৎকার, বুদ্ধিমান, নিমন্ত্রণ।

১১. এলোমেলো ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে লেখো :

- ছাগলছানাটা ভারি বুদ্ধিমান ছিল, সে বললে, ‘পঞ্চাশ বাঘে মোর এক-এক গ্রাস!’
- সকালে ছাগলছানা বাড়ি ফিরে এল।
- খেয়ে তার পেট এমন ভারী হলো যে, সে আর চলতে পারে না।
- সেদিন রাতে একটা গর্তের ভিতরে একটা ছাগলছানা থাকল।
- সে শুনে বাঘ পঁচিশ হাত লম্বা এক - এক লাফ দিয়ে শিয়ালকে সুদ্ধ নিয়ে পালাল।
- একথা শুনে ষাঁড় তাকে নিয়ে বনে গেল।
- সেই গর্তটা ছিল এক শিয়ালের।
- বাঘ তো শিয়ালকে বেশ করে লেজের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে।
- ছাগলছানা ষাঁড়ের সঙ্গে বনে যেতে চাইল।
- শিয়াল ফিরে এসে গর্তের ভিতরে কে ঢুকেছে তা জানতে চাইল।
- শিয়াল গেল বাঘের কাছে নালিশ জানাতে।
- শিয়াল বাঘের সঙ্গেও সেই গর্তের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছিল।
- ছাগলছানা বলল — ‘দূর হতভাগা! তোকে দিলুম দশ বাঘের কড়ি এক বাঘ নিয়ে এলি লেজে দিয়ে দড়ি!’

১২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো :

১২.১ এই গল্পে কাকে তোমার বুদ্ধিমান বলে মনে হয়েছে? তোমার এমন মনে হওয়ার কারণ কী?

১২.২ ‘বুদ্ধি যার বল তার’ — এই কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে এই গল্পে। এরকম অন্য কোনো গল্প তোমার জানা থাকলে লেখো।

১৩. গল্প থেকে অন্তত পাঁচটি সর্বনাম খুঁজে নিয়ে লেখো এবং সেগুলি ব্যবহার করে একটি করে বাক্য লেখো।

১৪. কারণ কী লেখো :

১৪.১ ছাগলছানা গর্তের বাইরে যেতে পেত না।

১৪.২ ষাঁড় এসে বলল, ‘এখন চলো বাড়ি যাই।’

১৪.৩ সে (শিয়াল) ভাবল বুঝি রাক্ষস - টাক্ষস হবে।

১৪.৪ ‘বাবা গো!’ বলে সেখান থেকে (শিয়ালের) দে ছুট!

১৪.৫ বাঘ ভয়ানক রেগে বললে, ‘বটে, তার এত বড়ো আস্পর্ধা!’

১৫. নীচের বাক্যগুলিতে কোন কোন ভাব প্রকাশ পেয়েছে তা লেখো :

(বিস্ময় / ইচ্ছা / প্রশ্ন / বিবেক / উপদেশ / পরামর্শ বা নির্দেশ / ভয়)

১৫.১ হ্যাঁগা, তুমি কী খাও ?

১৫.২ আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে হবে।

১৫.৩ যাসনে ! ভালুকে ধরবে, বাঘে নিয়ে যাবে, সিংহে খেয়ে ফেলবে !

১৫.৪ এখন চলো বাড়ি যাই।

১৫.৫ শুনেই তো শিয়াল, 'বাবা গো !' বলে সেখান থেকে দে ছুট।

১৫.৬ 'কী ভাগনে, এই গেলে, আবার এখুনি এত ব্যস্ত হয়ে ফিরলে যে ?'

১৬. গল্পটিতে কে কোন সময়ে কী করছিল তা লেখো:

ছাগলছানার মা	ছাগলছানা	ষাঁড়	শিয়াল	বাঘ

১৭. শক্তি, বুদ্ধি ও কাজের বিচারে বাঘ, শিয়াল ও ছাগলছানার আচরণ কেমন তা লেখো।

১৮. নিম্নলিখিত অংশে উপযুক্ত ছেদ ও যতিচিহ্ন বসাও :

খেয়ে তার পেট এমন ভারী হলো যে সে আর চলতে পারে না সন্ধে হলে ষাঁড় এসে বলল এখন চলো বাড়ি যাই কিন্তু ছাগলছানা কী করে বাড়ি যাবে সে চলতেই পারে না তাই সে বললে তুমি যাও আমি কাল যাব

১৯. নীচের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : মস্ত, বাইরে, লম্বা, ব্যস্ত, নিশ্বাস, সর্বনাশ, দূর।

শব্দার্থ : চমৎকার—সুন্দর। রাক্ষস — দৈত্য। গ্রাস — হাত দিয়ে মুখে তোলা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য। আস্পর্ধা — স্পর্ধা শব্দের কথ্য রূপ, দম্ভ। কড়ি — বিনিময়ের মাধ্যম, একধরনের মুদ্রা, কপর্দক। ক্ষেত — জমি। আল — এক জমি থেকে তার পাশের জমিকে আলাদা করার জন্য নির্মিত ছোটো বাঁধ। ঠোক্কর — ধাক্কা, হোঁচট। সারা হলো—অস্থির হলো (এখানে)। সাজা — শাস্তি।

২০. এই গল্পে শিয়ালকে নাকাল হতে দেখা গেছে। তুমি আরও এমন দুটি গল্প সংগ্রহ করো যেখানে একটিতে শিয়াল তার বুদ্ধির জোরে জিতে গেছে এবং অন্যটিতে সে তা পারেনি।

২১. গল্পে কোন কোন প্রাণীর নাম খুঁজে পেলে ? এদের খাদ্য ও বাসস্থান এবং স্বভাব উল্লেখ করো।

২২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

২২.১ ছাগলছানার মা তাকে কীভাবে সাবধান করত ? তার ভয় কাটল কীভাবে ?

২২.২ বনে সন্ধে হয়ে এলে সেখানে কোন পরিস্থিতি তৈরি হলো ?

২২.৩ ছাগলছানাকে শিয়াল ভয় পেল কেন ?

২২.৪ বাঘের উপর শিয়ালের রাগ হওয়ার কারণ লেখো।

২৩.　ছবির সঙ্গে মানানসই বাক্য লিখে গল্পটি সম্পূর্ণ করো :

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮
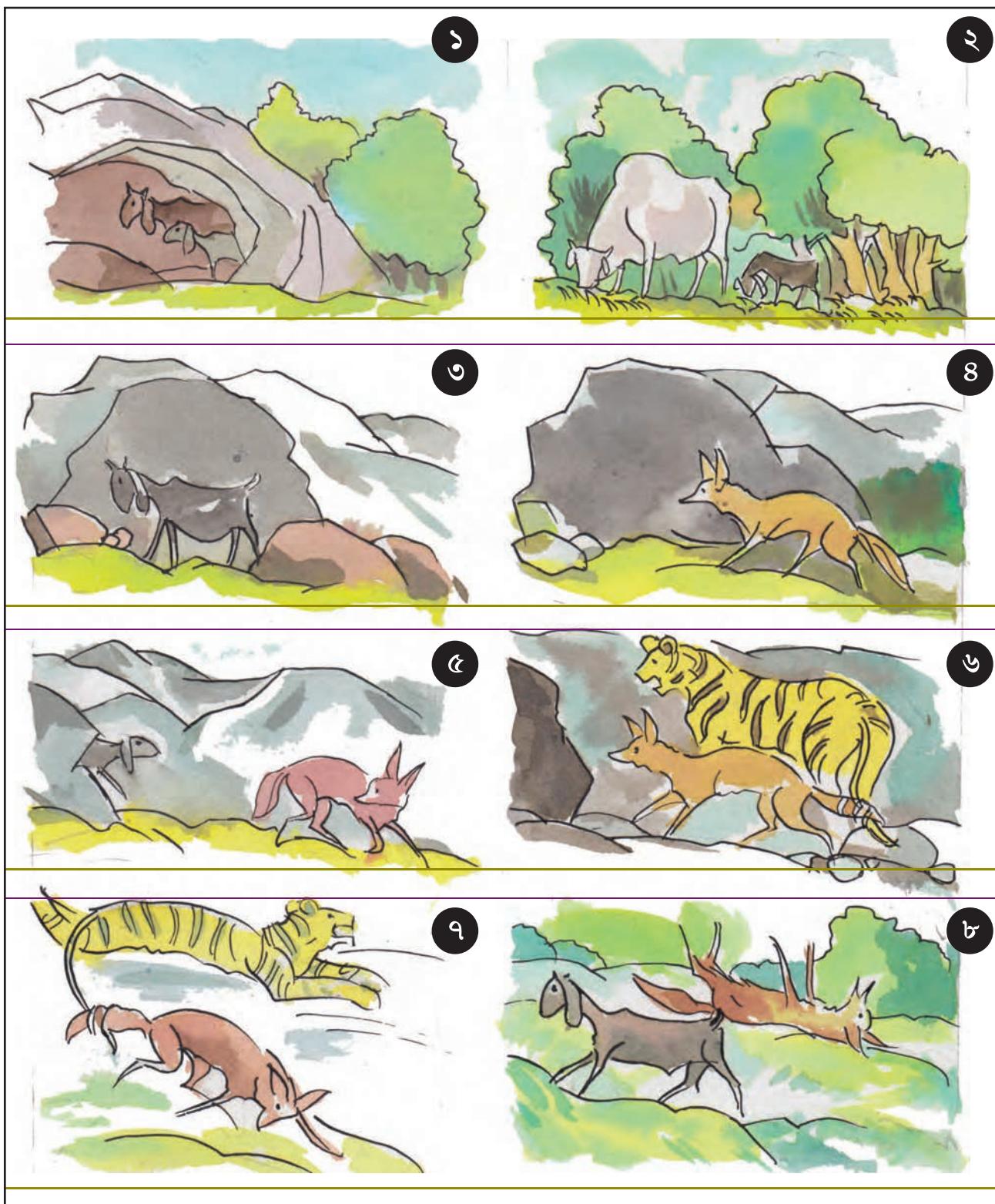
২৪. এখানে একটা খেলা দেওয়া হলো। দেখো তো এটা খেলতে ভালো লাগে কিনা। সাপ লুডোর মতো খেলা। লুডো খেলার মতন করেই খেলতে হবে। যেখানে বাঘের ছবি আঁকা আছে, সেখানে পড়লে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। প্রশ্নের জায়গায় পড়লে, প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়ে তবেই মই-এ করে উপরে ওঠা যাবে। শিয়ালের মুখে পড়লে পাঁচ ঘর পিছিয়ে যেতে হবে। যদি প্রশ্নের উত্তর কেউ না পারে তবে লুডোর ছক্কায় যত দান পড়বে সেই অনুযায়ী এগোবে।

১০০	৯৯	৯৮	৯৭	৯৬	৯৫	৯৪	৯৩	৯২	৯১
৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০
৮০	৭৯	৭৮	৭৭	৭৬	৭৫	৭৪	৭৩	৭২	৭১
৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬ প্রশ্ন	৬৭	৬৮	৬৯	৭০
৬০	৫৯	৫৮	৫৭ প্রশ্ন	৫৬	৫৫	৫৪	৫৩	৫২	৫১
৪১	৪২	৪৩ প্রশ্ন	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০ প্রশ্ন
৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫	৩৪	৩৩	৩২ প্রশ্ন	৩১
২১	২২	২৩	২৪ প্রশ্ন	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
২০ প্রশ্ন	১৯	১৮	১৭	১৬	১৫	১৪	১৩	১২ প্রশ্ন	১১
১ আরম্ভ	২	৩	৪ প্রশ্ন	৫	৬ প্রশ্ন	৭	৮	৯	১০

৪ নং ঘরের প্রশ্ন : বনের আর এক নাম
৬ নং ঘরের প্রশ্ন : বনের রাজা হলো
১২ নং ঘরের প্রশ্ন : যে পশু নাচতে জানে
২০ নং ঘরের প্রশ্ন : যার আরেক নাম অজ
২৪ নং ঘরের প্রশ্ন : ষাঁড় ছাড়া আরেক নিরামিষাশী প্রাণী হলো

৩২ নং ঘরের প্রশ্ন : পাহাড় শব্দটির সঙ্গে কোন শব্দটি মেলে
৪৩ নং ঘরের প্রশ্ন : যে কথা শুনে বাঘ ভাবল নরহরি দাস আসছে
৫০ নং ঘরের প্রশ্ন : গর্তে থাকে এমন একটি প্রাণীর নাম বলো
৫৭ নং ঘরের প্রশ্ন : 'কড়ি' শব্দটির অর্থ হলো
৬৬ নং ঘরের প্রশ্ন : 'সারা' শব্দটিকে দুটি অর্থে বাক্যে প্রয়োগ করে বলো

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে!
মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা মনে মনে।
তেপান্তরের পাথার পেরোই রূপ-কথার,
পথ ভুলে যাই দূর পারে সেই চুপ-কথার—
পারুলবনের চম্পারে মোর হয় জানা মনে মনে॥
সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি মেঘে মেঘে আকাশ-কুসুম তুলি।
সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
আমি যাই ভেসে দূর দিশে—
পরির দেশে বন্ধ দুয়ার দিই হানা মনে মনে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : বাংলাভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার এবং সুরকার। তাঁর রচিত গানগুলি ‘গীতিবিতান’ নামের বইতে কয়েক খণ্ডে বিধৃত রয়েছে। আর গানগুলির স্বরলিপি বিভিন্ন খণ্ডে রয়েছে ‘স্বরবিতান’ নামের বইয়ে।

তোত্তো-চানের অ্যাডভেঞ্চার

তেৎসুকো কুরোয়ানাগি

স্কুলের হলঘরে তাঁবু খাটানোর দু-দিন পরে ঘটনাটা ঘটেছিল। সেদিন তোত্তো-চান ইয়াসুয়াকি-চানকে ওর গাছে ওঠার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল, সে কথা দুজনের মা-বাবা কেউই জানতেন না।

তোমোই-তে সবার একটা করে গাছ ছিল। মানে, স্কুল চত্বরে যে গাছগুলো ছিল, ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকে তার একটা করে দখল করে নিয়েছিল। সবাই যে যার নিজের গাছে চড়ত। তোত্তো-চানের গাছটা ছিল বেড়ার কাছে, যে রাস্তাটা কুহনবুৎসুর দিকে চলে গেছে ঠিক তার ধারে। বেশ বড়ো একটা গাছ, গাছের গা-টা পিছল, কিন্তু তুমি যদি একটু কায়দা করে একবার উঠে পড়তে পারো, তাহলে দেখবে মাটি থেকে ছ-ফুট উঁচুতে একটা ডাল এমনভাবে ভাগ হয়ে গেছে যে তার উপরে চড়লে বেশ একটা দড়ির দোলনায় চেপেছি বলে মনে হবে। সেখানে উঠে তোত্তো-চান প্রায়ই টিফিনের সময় বা ছুটির পরে নীচের লোকজন আর উপরের আকাশটাকে দেখত।

ছেলেমেয়েরা মনে করত গাছগুলো তাদের নিজেদের সম্পত্তি, ফলে কেউ যদি আর কারো গাছে চড়তে চাইত, তাহলে তাকে গিয়ে বিনীতভাবে বলতে হতো, 'আমি কি একটু ভিতরে আসতে পারি?'

ইয়াসুয়াকি-চানের পোলিয়োর জন্য পায়ে অসুবিধে ছিল বলে ওর কোনো নিজস্ব গাছ ছিল না। সেজন্যেই তোত্তো-চান ওকে ওর গাছে নেমন্তন্ন করেছিল। এই কথাটা অবশ্য ওরা আর কাউকে বলেনি, কারণ শুনলেই সবাই খুব ঝামেলা করবে, তা ওরা জানত।

বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় তোত্তো-চান মা-কে বলেছিল, ডেনেনচফুতে ইয়াসুয়াকি-চানের বাড়িতে যাচ্ছে। মিছে কথা বলেছিল বলে ও মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না। তাই ও জুতোর ফিতের দিকে

তাকিয়ে ছিল। কিন্তু রকি তো যথারীতি ওর পিছনে পিছনে স্টেশন পর্যন্ত এসেছিল। তখন ট্রেনে চাপার আগে তোত্তো-চান রকিকে সত্যি কথাটা বলে দিয়েছিল, 'দ্যাখ, আমি স্কুলে যাচ্ছি ইয়াসুয়াকি-চানকে আমার গাছে চড়ার নেমন্তন্ন করেছি বলে!'

গলায় টিকিটটা ঝুলিয়ে তোত্তো-চান স্কুলে গিয়ে দেখল ইয়াসুয়াকি-চান ফুলগাছগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এমনিতে কেউ কোথাও নেই, গ্রীষ্মের ছুটি চলছিল তো তাই। ইয়াসুয়াকি-চান তোত্তো-চানের থেকে বয়সে সামান্যই বড়ো ছিল, কিন্তু ওর কথা শুনে মনে হতো ও বুঝি অনেকটা বড়ো।

তোত্তো-চানকে দেখামাত্র ইয়াসুয়াকি-চান তাড়াহুড়ো করে পা-টা টেনে টেনে, হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে এল। ওরা যে লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু একটা করতে চলেছে এটা ভাবতেই তোত্তো-চানের খুব হাসি পেল। ইয়াসুয়াকি-চানও হি হি করে হাসতে থাকল। ইয়াসুয়াকি-চানকে নিয়ে তোত্তো-চান ওর গাছের দিকে এগিয়ে গেল, তারপর ছুট দিল দারোয়ানের ঘর থেকে একটা মই নিয়ে আসবার জন্য। এ রকমই ও ভেবে রেখেছিল গত রাত থেকে। মইটা নিয়ে এসে ও গাছের গায়ে এমনভাবে ঠেকিয়ে রাখল যাতে মইয়ের মাথাটা সেই ভাগ-হওয়া ডালটাকে ছুঁতে পারে। এবার নিজে তরতর করে উঠে গিয়ে মইয়ের মাথাটা দু-হাত দিয়ে ধরে রেখে ইয়াসুয়াকি-চানকে বলে উঠল, 'এবারে চলে এসো তুমি। ওঠার চেষ্টা করো!'

ইয়াসুয়াকি-চানের হাতে পায়ে এতই কম জোর ছিল যে মইয়ের প্রথম ধাপটাও বিনা সাহায্যে ওঠা ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তোত্তো-চান পিছন ফিরে নেমে এল, এসে ইয়াসুয়াকি-চানকে নীচ থেকে ঠেলে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বেচারা তো নিজেই ছোটোখাটো রোগা একটা মানুষ, ও কী অতশত পারে? মইটাকেই সোজা করে রাখা যাচ্ছিল না, ইয়াসুয়াকি-চানকে তো দূরের কথা। ইয়াসুয়াকি-চান মইয়ের প্রথম ধাপ থেকে পা নামিয়ে চুপটি করে, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। এবং এই প্রথম তোত্তো-চান বুঝতে পারল যে কাজটা যতটা সহজ মনে করেছিল, ততটা সহজ হবে না। এখন তাহলে কী করবে ও?

ইয়াসুয়াকি-চান ওর গাছে চড়বে, এটাই ছিল ওর ইচ্ছে। আর ইয়াসুয়াকি-চানও তাই আশা করেছিল। তোত্তো-চান ঘুরে গিয়ে ইয়াসুয়াকি-চানের মুখোমুখি দাঁড়াল। বেচারা এত মনমরা হয়ে গিয়েছিল যে তোত্তো-চান গাল ফুলিয়ে, চোখ পিট পিট করে একটা মজার মুখভঙ্গি করে ওকে হাসানোর চেষ্টা

করতে লাগল। তারপর বলল, 'দাঁড়াও, একটা জিনিস করা যাক!' দারোয়ানের ঘরে ছুটে গিয়ে ও একটার পর একটা জিনিস টেনে বের করতে লাগল, কাজে লাগানোর জন্য কিছু পায় কিনা দেখার জন্য। শেষ পর্যন্ত একটা বাড়ির সিঁড়ির মতন মই পেয়ে গেল। ওটা এমনিতেই সোজা হয়ে থাকে, কাউকে ধরে থাকতে হয় না।

ওই সিঁড়ি-মইটা ও টেনে নিয়ে এল গাছের গোড়ায়। নিজের গায়ের জোরে ও নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল। মইটা সেই দু-ভাগ হওয়া ডালটাকে প্রায় ছুঁতে পারছিল। বেশ বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব করে ও ইয়াসুয়াকি-চানকে বলল, 'এবার আর ভয় নেই। এটা লকবক করবে না।'

ইয়াসুয়াকি-চান ভয়ে ভয়ে একবার সিঁড়ি-মইটার দিকে তাকাল, একবার তোত্তো-চানের দিকে। তোত্তো-চানের সারা শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছিল। ইয়াসুয়াকি-চান নিজেও খুব ঘামছিল। ও গাছটার দিকে তাকাল, তারপর মনে মনে খুব শক্ত হয়ে ওর প্রথম পা রাখল সিঁড়ির প্রথম ধাপে।

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছোতে যে কতক্ষণ লেগেছিল, তা ওরা দুজনের একজনও বলতে পারবে না। গনগনে সূর্যটা ওদের মাথার উপর জ্বলছিল। কিন্তু ওদের সেসব কিছুর দিকেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। দুজনের মাথাতে তখন একটাই চিন্তা — ইয়াসুয়াকি-চানকে গাছে চড়তেই হবে। তোত্তো-চান নীচ থেকে ওর একটা একটা করে পা, এক ধাপ এক ধাপ উপরের সিঁড়িতে তুলে দিচ্ছিল, আর নিজের মাথা দিয়ে ইয়াসুয়াকি-চানের পিছনটা ঠেলে দিচ্ছিল। অবশেষে ইয়াসুয়াকি-চান মইয়ের মাথায় পৌঁছোল।

'হুর্‌রে!'

কিন্তু তারপর বাকিটা যেন অসম্ভব মনে হলো। তোত্তো-চান লাফিয়ে দু-ভাগ হওয়া ডালে চড়ে বসল। এবার ইয়াসুয়াকি-চানকে মই থেকে ডালে নিয়ে আসবে কেমন করে? সিঁড়ি-মইটাকে আঁকড়ে ধরে ইয়াসুয়াকি-চান তোত্তো-চানের দিকে তাকিয়ে রইল। তোত্তো-চানের খুব কান্না পাচ্ছিল। ও যে ভেবেছিল ইয়াসুয়াকি-চানকে ওর ডালে নিয়ে এসে কত কী দেখাবে! কিন্তু কাঁদল না ও, কাঁদলে যদি ইয়াসুয়াকি-চানও কেঁদে ফেলে।

তোত্তো-চান হাত বাড়িয়ে ইয়াসুয়াকি-চানের হাতটা ধরল। পোলিয়োতে ওর আঙুলগুলোও সব দলা পাকিয়ে গিয়েছিল। তবু তোত্তো-চানের চেয়ে হাতটা বড়ো ছিল, আঙুলগুলোও লম্বা অনেকটা। তোত্তো-চান অনেকক্ষণ হাতটা ধরে রইল, তারপর বলল, 'তুমি শুয়ে পড়ো আর আমি দেখি তোমাকে টেনে তুলতে পারি কিনা।'

বড়োরা কেউ যদি এই ভয়ানক বিপজ্জনক দৃশ্যটি দেখতেন — ভাগ হওয়া ডালে তোত্তো-চান দাঁড়িয়ে মইয়ের মাথায় পেটের উপর ভর দিয়ে শোওয়া ইয়াসুয়াকি-চানকে প্রাণপণ টেনে চলেছে — তাহলে নিশ্চয় চিৎকার করে উঠতেন। কিন্তু ইয়াসুয়াকি-চান তো সমস্ত আস্থা রেখেছিল তোত্তো-চানের

উপর। আর তার জন্যে তোত্তো-চান জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল। ওর ছোট্ট হাতের মুঠোয় ইয়াসুয়াকি-চানের হাত, সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। এক এক সময় এক এক টুকরো মেঘ এসে ওদের প্রখর সূর্যের তাপের হাত থেকে রক্ষা করে যাচ্ছিল। অবশেষে দুজনে গাছের ডালের উপর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারল। তোত্তো-চান ঘামে ভেজা চুল মুখের উপর থেকে সরিয়ে মাথা নীচু করে ইয়াসুয়াকি-চানকে আমন্ত্রণ জানাল : 'স্বাগতম!' ইয়াসুয়াকি-চান গাছের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে, লাজুকভাবে হেসে বলল, 'আসতে পারি ভিতরে?' ও তো কখনও এমন দৃশ্য দেখেনি এর আগে। 'গাছে ওঠা ব্যাপারটা তাহলে এইরকম!' বলে ও হাসল।

দুই বন্ধুতে বেশ অনেকক্ষণ রইল গাছের উপরে। বসে বসে ওরা নানান গল্প করল। 'জানো, আমার দিদি তো আমেরিকায় থাকে, ও বলেছে ওদের নাকি টেলিভিশন বলে একটা জিনিস আছে,' ইয়াসুয়াকি-চান খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল। 'ও বলেছে জাপানে যখন টেলিভিশন আসবে তখন আমরা বাড়িতে বসেই সুমো পালোয়ানদের দেখতে পাব। টেলিভিশন নাকি একটা বাক্সের মতন, আমার দিদি বলেছে।'

ইয়াসুয়াকি-চান, যে কিনা একটা মাঠেও ঘুরে বেড়াতে পারে না, তার কাছে এই ঘরে বসে বসে বাইরের পৃথিবীটাকে দেখতে পাওয়ার মানে যে কী হতে পারে, তা বোঝার মতন বড়ো তোত্তো-চান হয়নি তখনও। ও কেবল ভাবছিল, একটা ঘরের ভিতরে একটা বাক্স, তার মধ্যে ইয়া বড়ো বড়ো সুমো পালোয়ান — এটা কেমন করে হতে পারে? ব্যাপারটা হলে কিন্তু দারুণ হবে, ও ভাবছিল। তখনকার দিনে আসলে কেউ টেলিভিশনের কথা জানত না। ইয়াসুয়াকি-চানই প্রথম তোত্তো-চানকে যন্ত্রটার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিল।

দূরে পাখির গান শোনা যাচ্ছিল। আর গাছের ডালে বসে দুটি শিশু পরম আনন্দে গল্প করছিল। ইয়াসুয়াকি-চানের সেই প্রথম গাছে চড়া।

হাতে কলমে

তেৎসুকো কুরোয়ানাগি (জন্ম ১৯৩৩) : জাপানের সবচেয়ে জনপ্রিয় টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ছিলেন তেৎসুকো কুরোয়ানাগি। তিনি একসময় তাঁর ছোটোবেলার স্কুলজীবনের স্মৃতিকে কেন্দ্র করে লেখেন *তোত্তো-চান*। ছোট্টো খুকু বলতে যা বোঝায় *তোত্তো-চান* কথাটির অর্থ অনেকটা তাই। তবে এ শুধুমাত্র স্মৃতি-নির্ভর কোনো রচনা নয়। এই বইকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে এক আদর্শ শিক্ষকের সর্বকালের সর্বজনীন এক শিক্ষাব্যবস্থার নানা দিক। লেখিকার অসাধারণ বর্ণনাশৈলীর গুণে বইটি সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং সমাদৃত হয়েছে। মূল জাপানি ভাষা থেকে এই বইটির ইংরাজি অনুবাদ করেন ডরোথি ব্রিটন। আর সেই ইংরাজি অনুবাদ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন মৌসুমী ভৌমিক। আধুনিক বাংলা গানের তিনি একজন উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা ও শিল্পী।

১. 'তোত্তো-চান' শব্দটির অর্থ কী?

২. 'তোত্তো-চান' বইটির লেখিকার নাম কী?

৩. **নীচের এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো :**

লো য়া পা ন / ঘ ল র হ / তি রী থা য

ভি টে শ লি ন / সা ৎ উ হ / ক্ষ অ ক নে ণ

৪. **বন্ধনীর থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে আবার লেখো :**

৪.১ তোত্তো-চান তার বন্ধুকে (খাবার খাওয়া/বাড়িতে যাওয়া/গাছে চড়া/দোলনায় ওঠা)-র নিমন্ত্রণ করেছিল।

৪.২ তোত্তো-চানের গাছটা ছিল (রাস্তার মাঝখানে/বাড়ির উঠোনে/বেড়ার ধারে/বাগানের মধ্যে)।

৪.৩ তোত্তো-চান গাছে ওঠার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল (রকি/বাবা/দারোয়ান/ ইয়াসুয়াকি-চান) কে।

৪.৪ তোত্তো-চান মই নিয়ে এসেছিল (বাড়ি/দারোয়ানের ঘর/ দোকান/শ্রেণিকক্ষ) থেকে।

৪.৫ ইয়াসুয়াকি-চানের (পোলিয়োর/ টাইফয়েডের/ নিউমোনিয়া/জন্ডিসের) জন্য গাছে চড়ার অসুবিধা ছিল।

৫. **কোনটি বেমানান চিহ্নিত করো :**

৫.১ গাছ/ডাল/পাতা/রাস্তা

৫.২ হলঘর/কলঘর/উঠোন/চিলেকোঠা

৫.৩ সিঁড়ি/মই/তাঁবু/ধাপ

৫.৪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/জাপান/বাংলাদেশ/পশ্চিমবঙ্গ

৫.৫ সুমো/বক্সিং/ব্যাডমিন্টন/ ক্যারাটে

৬. **ঘটনাক্রম অনুযায়ী সাজাও :**

৬.১ গলায় টিকিটটা ঝুলিয়ে তোত্তো-চান স্কুলে গিয়ে দেখল ইয়াসুয়াকি-চান ফুলগাছগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

৬.২ সেদিন তোত্তো-চান ইয়াসুয়াকি-চানকে ওর গাছে ওঠার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

৬.৩ সিঁড়ি-মইটা ও টেনে নিয়ে এল গাছের গোড়ায়।

৬.৪ অবশেষে ইয়াসুয়াকি-চান মইয়ের মাথায় পৌঁছোল।

৬.৫ ইয়াসুয়াকি-চানকে বলে উঠল, 'এবার চলে এসো তুমি।'

৭. **শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দটি বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৭.১ _____ তে সবার একটা করে গাছ ছিল।

৭.২ তোত্তো-চানের গাছটা ছিল ____ র ধারে।

৭.৩ ইয়াসুয়াকি-চানের ____ র জন্য পায়ে অসুবিধা ছিল।

৭.৪ টেলিভিশন নাকি একটা ____ মতন।

৭.৫ তার মধ্যে ইয়া বড়ো বড়ো ____ পালোয়ান।

শব্দঝুড়ি
সুমো, বেড়া,
তোমোই, পোলিয়ো, বাক্স

৮. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৮.১ তোত্তো-চান কাকে গাছে চড়ার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল?

৮.২ গাছে চড়ার নিমন্ত্রণের কথা কারা জানতেন না?

৮.৩ কোথায় সবার একটা করে গাছ ছিল?

৮.৪ স্কুল চত্বরে কারা গাছগুলোর দখল নিয়েছিল?

৮.৫ টিফিনের সময় বা ছুটির পরে তোত্তো-চান কী করত?

৮.৬ ইয়াসুয়াকি-চানের পায়ে কী অসুবিধে ছিল?

৮.৭ তোত্তো-চান মাকে কী বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল?

৮.৮ স্কুলে গিয়ে তোত্তো-চান কী দেখেছিল?

৮.৯ তোত্তো-চান কোথা থেকে মই সংগ্রহ করেছিল?

৮.১০ মইয়ের মাথায় পৌঁছেও ইয়াসুয়াকি-চান গাছের উপর উঠতে পারছিল না কেন?

৮.১১ ইয়াসুয়াকি-চানের হাতটা কেমন ছিল?

৯. নীচের বাক্যগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৯.১ তোত্তো-চান গাছের ওপর উঠে কীভাবে সময় কাটাত?

৯.২ ছেলেমেয়েরা গাছগুলোকে কীভাবে আপন করে নিয়েছিল?

৯.৩ বন্ধুকে কীভাবে গাছে ওঠাবে বলে তোত্তো-চান পরিকল্পনা করেছিল?

৯.৪ টেলিভিশনের গল্প শুনে তোত্তো-চান কী ভেবেছিল?

৯.৫ 'এই প্রথম তোত্তো-চান বুঝতে পারল ...' — তোত্তো-চান কী বুঝতে পারল? কাজটা কেন সহজ ছিল না, লেখো।

৯.৬ তোত্তো-চান তার বন্ধু ইয়াসুয়াকি-চানকে গাছে ওঠার নিমন্ত্রণ করেছিল কেন?

৯.৭ দুই বন্ধু গাছের উপর বসে টেলিভিশন নিয়ে কী গল্প করেছিল?

৯.৮ তুমি তোমার প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে যে ধরনের গল্প করো তা নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

৯.৯ বাড়ি বা স্কুলের কোন গাছটা তোমার একেবারে নিজের বলে মনে হয়? সেই বন্ধুর যত্ন তুমি কীভাবে করো?

৯.১০ গাছে যদি তোমার একটি বাড়ি থাকত, তুমি কীভাবে সেখানে সময় কাটাতে কয়েকটি বাক্যে লেখো।

শব্দার্থ : বিজ্ঞ --- জ্ঞানী, অভিজ্ঞ। হুর্‌রে --- আনন্দসূচক ধ্বনি। আমন্ত্রণ --- আহ্বান, নিমন্ত্রণ। স্বাগতম — অভিবাদন। তোমোই — তোত্তো-চানের স্কুল। কুহনবুৎসু — তোমোইয়ের উপাসনাস্থল।

১০. প্রতিশব্দ লেখো : গাছ, মাটি, সূর্য, রাস্তা, আকাশ।

১১. বর্ণ বিশ্লেষণ করো : তরতর, ছোটোখাটো, ভয়ানক, লাজুক, অ্যাডভেঞ্চার।

১২. নীচের গদ্যটিতে যতিচিহ্ন ব্যবহার করো।

তোত্তোচান ঘামেভেজা চুল মুখের ওপর থেকে সরিয়ে মাথা নীচু করে ইয়াসুয়াকি চানকে আমন্ত্রণ জানালো স্বাগতম ইয়াসুয়াকিচান গাছের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে লাজুকভাবে হেসে বলল আসতে পারি ভেতরে ও তো কখনো এমন দৃশ্য দেখেনি এর আগে গাছে ওঠা ব্যাপারটা তাহলে এইরকম বলে ও হাসল

১৩. নীচের এক একটি বিষয় নিয়ে কমপক্ষে পাঁচটি বাক্য লেখো : খেলা, গাছ, নেমন্তন্ন।

১৪. একটা গাছবাড়ির ছবি আঁকো।

জেনে রাখো :

পোলিয়ো — পোলিয়ো বা পোলিয়োমাইলাইটিস একটি জীবাণুবাহিত সংক্রামক অসুখ। এই অসুখে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ফলস্বরূপ হাত ও পায়ের পেশিতে বিকৃতি দেখা দেয়। একসময় সারা পৃথিবীতে এই রোগ মহামারির আকার নিয়েছিল। হিলারি কোপ্‌রোস্কি, জোনাস সাল্ক, অ্যালবার্ট সাবিন প্রমুখ জীববিজ্ঞানীর চেষ্টায় গত শতকের মাঝামাঝি এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়। ২০১২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা ভারতকে পোলিয়ো রোগমুক্ত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বনভোজন

গোলাম মোস্তাফা

নূরু, পুষি, আয়ষা, শফি — সবাই এসেছে,
আম-বাগিচার তলায় যেন তারা হেসেছে!
রাঁধুনিদের সখের রাঁধার পড়ে গেছে ধুম,
বোশেখ মাসের এই দুপুরে নাইকো কারো ঘুম।
বাপ-মা তাদের ঘুমিয়ে আছে, এই সুবিধা পেয়ে
বনভোজনে মিলেছে আজ দুষ্টু ক'টি মেয়ে!

কেউ এনেছে আঁচল ভ'রে কুড়িয়ে আমের গুটি,
নারিকেলের মালার হাঁড়ি কেউ এনেছে দুটি,
কেউ এনেছে চৈত-পুজোতে কেনা রঙিন খুরি,
কেউ এনেছে ছোট্ট বঁটি, কেউ এনেছে ছুরি।
ব'সে গেছে সবাই আজি বিপুল আয়োজনে,
ব্যস্ত সবাই আজকে তাদের ভোজের নিমন্ত্রণে!
কেউ বা বসে হলদি বাটে, কেউ বা রাঁধে ভাত,
কেউ বা বলে—'দুত্তরি ছাই, পুড়েও গেল হাত!'
বিনা আগুন দিয়েই তাদের হচ্ছে সবার রাঁধা,
তবু সবার দুই চোখেতে ধোঁয়া লেগেই কাঁদা!
কোর্মা পোলাও কেউ বা রাঁধে, কেউ বা চাখে নুন,
অকারণে বারেবারে হেসেই বা কেউ খুন।
রান্না তাদের শেষ হলো যেই, গিন্নি হলো নূরু,
এক লাইনে সবাই বসে করল খাওয়া শুরু!
ধুলো-বালির কোর্মা-পোলাও, আর সে কাদার পিঠে
মিছিমিছি খেয়ে সবাই বল্লে—'বেজায় মিঠে!'
এমন সময় হঠাৎ আমি পড়েছি যেই এসে,
পালিয়ে গেল দুষ্টুরা সব খিলখিলিয়ে হেসে!

হাতে কলমে

গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৭-১৯৬৪) : অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ঝিনাইদহ জেলার মনোহরপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত, উচ্চশিক্ষিত পরিবারে কবির জন্ম। বাংলা ও আরবি ভাষায় তাঁর সমান দখল ছিল। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস *রূপের নেশা*। প্রথম কবিতা গ্রন্থ *রক্তরাগ* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। বহু ইংরাজি ও আরবি গ্রন্থের বাংলা তরজমা ছাড়াও গোলাম মোস্তাফা অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *হাস্নাহেনা, ভাঙাবুক, সাহারা, গুলিস্তান, বুলবুলিস্তান* ইত্যাদি।

১. গোলাম মোস্তাফা কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

২. তাঁর দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

৩. **একটি বাক্যে উত্তর দাও:**

৩.১ কবিতাটিতে কারা খেলতে এসেছিল?

৩.২ 'বাগিচা' শব্দের অর্থ কী?

৩.৩ রান্নার জন্য তারা কী কী সঙ্গে এনেছিল?

৩.৪ কবিতায় কে মিছিমিছি গিন্নি সেজেছিল?

৩.৫ মিছিমিছি কী কী খাবার রাঁধা হয়েছিল?

৩.৬ কবিতায় ওদের খেলার মাঝে কে এসে পড়েছিল?

৪. **যেটি ঠিক সেটি বেছে নিয়ে লেখো:**

৪.১ কবিতাটিতে (৪/৩/৫) টি মেয়ের কথা বলা হয়েছে।

৪.২ বিনা (আগুন/জল/কাদা) দিয়েই তাদের হচ্ছে সবার রাঁধা।

৪.৩ (আম/জাম/চা) বাগিচার তলায় যেন তারা হেসেছে।

৫. **শব্দঝুড়ি থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও:**

৫.১ ____ মাসের এই দুপুরে নাইকো কারো ঘুম।

৫.২ নারিকেলের মালার ____ কেউ এনেছে দুটি।

৫.৩ কেউ এনেছে ছোট্ট বঁটি,কেউ এনেছে ____ ।

৫.৪ বসে গেছে সবাই আজি ____ আয়োজনে।

৫.৫ এমন সময় হঠাৎ ____ পড়েছি যেই এসে।

শব্দঝুড়ি
হাঁড়ি, বোশেখ,
ছুরি, আমি, বিপুল

৬ **‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো:**

ক	খ
নুন	বাগান
ধোঁয়া	বড়ো
বিপুল	লবণ
আগুন	নিদ্রা
ঘুম	ধূম
বাগিচা	অগ্নি

শব্দার্থ : বাগিচা — ছোটো বাগান। চৈত — চৈত্র, বাংলা বর্ষের শেষ মাস (‘চৈত্র’ শব্দের পদ্য রূপ।) খুরি — মাটির পাত্র। বাটে — পেষাই করে। চাখে — স্বাদগ্রহণ করে। মিঠে — মিষ্টি। বাগিচা — বাগান। বনভোজন— দল বেঁধে বাড়ির বাইরে গিয়ে রান্না করে খাওয়া । সখ— ইচ্ছা। আয়োজন— উদ্যোগ/সংগ্রহ । বিপুল— বড়ো। ভোজ— নানান রকম ভালো খাবারের আয়োজন। ব্যস্ত— ব্যাকুল।

৭. **নীচের বর্ণগুলি যোগ করে শব্দ তৈরি করো:**

স্ + অ + ব্ + আ + ই =

র্ + আ + ধ + উ + ন্ + ই =

ব্ + আ + গ্ + ই + চ্ + আ =

ব্ + য্ + অ + স্ + ত্ + অ =

দ্ + উ + ষ্ + ট্ + উ =

৮. **এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো:**

লে রি না কে, ন ভো ন ব জ, র কা অ ণে , ন য়ো জ আ, ণ ম নি ন্ত্র

৯. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :** গিন্নি, আঁচল, নিমন্ত্রণ, কোর্মা, রঙিন

১০. **কবিতাটিতে অন্তমিল আছে, এমন পাঁচজোড়া শব্দ লেখো :** যেমন — ধুম/ঘুম

১১. কবিতায় ধুলো-বালি দিয়ে কোর্মা-পোলাও ও কাদা দিয়ে পিঠে তৈরির কথা বলা হয়েছে। মিছিমিছি রান্নাবাটি খেলায় আর কী কী রান্না ধুলো-বালি,কাদা দিয়ে তৈরি করতে পারো লিখে জানাও।

১২. **বাক্যরচনা করো:** বনভোজন, মিছিমিছি,বাগিচা,আঁচল, ছুরি, নিমন্ত্রণ

১৩. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো:**

১৩.১ নূরু, শফিরা দুপুরবেলা ঘুমোয়নি কেন?

১৩.২ কবি এসে পড়ায় সবাই পালিয়ে গিয়েছিল কেন?

১৩.৩ বন্ধুদের সঙ্গে কখনও বনভোজনে গিয়ে থাকলে সেই অভিজ্ঞতার কথা কয়েকটি বাক্যে লেখো।

১৩.৪ বৈশাখ মাসের দুপুরে নূরু, পুষি, আয়ষা, শফিরা মিছিমিছি রান্নাবাটি খেলা খেলছিল। তুমি গরমের ছুটিতে দুপুর বেলাগুলো কেমন করে কাটাও সে বিষয়ে লেখো।

১৪. গদ্যরূপ লেখো : বোশেখ, চৈত, হলদি, মিঠে

১৫. একই অর্থের শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো : ইচ্ছা, বাগান,চড়ুইভাতি,নিদ্রা

১৬. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো: আজি,ছোটো, হেসে,শুরু, তলায়

১৭. নীচের সূত্রগুলি কাজে লাগিয়ে শব্দ ছকটি পূরণ করো:

১.		২.				৩.
					৪.	
				৫.		
৬.			৭.			
	৮.			৯.		
১০.			১১.			

পাশাপাশি

১. আঁচল ভরে কী কুড়িয়ে এনেছে?
৪. মাটির তৈরি ছোটো ভাঁড়
৬. নূরু কী হয়েছিল?
৭. ____,পুষি, আয়ষা,শফি
১০. রাঁধতে গিয়ে কী পুড়ে গেছিল?
১১. কাদা দিয়ে কী তৈরি করা হয়েছিল?

উপর নীচ

১. নূরু, শফিরা কীসের তলায় খেলছিল?
২. রঙে পূর্ণ
৩. হাঁড়ি কী দিয়ে বানানো হয়েছে?
৫. শেষের বিপরীত শব্দ
৮. বাঙালিদের প্রধান খাদ্য
৯. সবাই বল্লে, ‘বেজায় ____।’

<u>সমাধান:</u>
পাশাপাশি : ১. আমেরগুটি ৪. খুড়ি ৬. গিন্নি ৭. নূরু ১০. হাত ১১. পিঠে।
উপরনীচ : ১. আমবাগিচা ২. রঙিন ৩. নারিকেলের মালা ৫. শুরু ৮. ভাত ৯. মিঠে।

ছেলেবেলার দিনগুলি

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

নতুন বাড়িটা জ্যেঠামশাই ও পিসিমার বাড়ির কাছেই ছিল, সুতরাং খেলার সাথীর অভাব হলো না। জ্যেঠতুতো, খুড়তুতো, পিসতুতো ভাইবোনদের দল জুটে গেল।

ছাতের এক কোণে ঘোলা জলের ট্যাঙ্ক থেকে গঙ্গামাটি তুলে জমা করা ছিল, তাই দিয়ে গোলা-গুলি বানিয়ে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলো। সে যুদ্ধের নাম দেওয়া হয়েছিল পটগুলটিশ ওয়ার। নরম কাদার গুলিতে খেলা বেশ ভালোই চলছিল। হঠাৎ কী কুবুদ্ধি হলো গুলিগুলোকে বেশ লাল করে পুড়িয়ে নিলাম। দুপুরবেলায় যখন চাকরবাকররা বিশ্রাম করতে যেত, তখন চুপিচুপি রান্নাঘরে ঢুকে মরা

উনুনের মধ্যে গুলি গুঁজে দিয়ে আসতাম, ওরা উনুন ঝাড়বার সময় সেগুলি বেছে ধুয়ে আমাদের দিয়ে দিত। কিন্তু তাতে দু-পক্ষই এমনভাবে ‘আহত’ হতে আরম্ভ করল যে, আমাদের রান্নাঘরে যাওয়াই বারণ হয়ে গেল।

আরেকদিন জ্যেঠামশাই-র বাড়িতে পটগুলটিশ খেলা হচ্ছে, হঠাৎ একজনের হাতের গোলা-টা ছিটকে সিঁড়ির ছাতের তলার দিকে (সিলিং-এ) লেগে একেবারে ঘুঁটের মতো চ্যাপটা হয়ে সেঁটে রইল। ভারি মজা, সবাই মিলে ঘুঁটে দেওয়ার পাল্লা শুরু করলাম। দেখতে দেখতে ছাতটা কাদার ঘুঁটেতে ভরতি হয়ে গেল। এমন সময় জ্যেঠামশাই-এর পায়ের শব্দ শুনে যে যেখানে পারল লুকিয়ে পড়ল। জ্যেঠামশাইকে ও বাড়ির ছেলেরা ভীষণ ভয় করত। তাঁর চেহারা আর গলার আওয়াজ ছিল গম্ভীর। শুনতাম তিনি মস্ত বড়ো খেলোয়াড়, গায়ে খুব জোর, আর রাগও খুব। আমরা কিন্তু কোনোদিন তাঁর রাগ দেখিনি। যখনই ও বাড়ি যেতাম, দেখতাম তিনি একমনে লেখাপড়া করছেন। যদি কখনও আমাদের দিকে চোখ পড়ত, মৃদু হেসে দুয়েকটা কথা বলতেন। যা হোক, ওদের দেখাদেখি, আমরাও লুকোলাম।

জ্যেঠামশাই আনমনে কী ভাবতে ভাবতে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, হঠাৎ থ্যাপ করে কী একটা তাঁর পায়ের কাছে পড়ল। চমকে উঠে তিনি গুরুগম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন, ‘এই কে আছিস, আলো আন।’ চাকর ছুটে গিয়ে সিঁড়ির আলোটা উসকিয়ে সামনে ধরতেই দেখা গেল একতাল থলথলে কালোমতন কী জিনিস। ধমক দিয়ে বললেন, ‘এটা আবার কী, কোত্থেকে এল?’ চাকর কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ‘আজ্ঞে, ছেলেরা কী যেন খেলা করছিল—’ তখন কী ভেবে হঠাৎ উপর দিকে তাকিয়ে ছাতের ছিরি দেখেই জ্যেঠামশাই হো হো করে হেসে উঠলেন, আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আরেকদিন চোর-পুলিশ খেলছি। দাদা হয়েছে পুলিশ, আমি চোর। আমার হাতে সাপমুখো বালা ছিল, তার একটা মুখ টেনে ফাঁক করে অন্য বালাটা তার ভিতর দিয়ে গলিয়ে দিব্যি হাতকড়ি বানিয়ে দাদা আমাকে ধরে নিয়ে চলল। আমি যেই এক ঝটকায় হাত ছাড়াতে গিয়েছি, অমনি নতুন বালা ভেঙে দু-তিন টুকরো হয়ে ছাতে ছড়িয়ে পড়ল। টুকরোগুলো কুড়িয়ে মার কাছে নিয়ে গেলাম। মা হেসে বললেন, ‘তোমাকে দেখছি এবার লোহার বালা গড়িয়ে দিতে হবে।’

ক্রিকেট হকি প্রভৃতি খেলাতেও ‘হাতেখড়ি’ ওই ছাতেই আরম্ভ হয়েছিল। আমি একটু ‘দস্যি’ ছিলাম কিনা, দাদাদের সঙ্গে যত সব হুড়োহুড়ি খেলায় খুব মজবুত ছিলাম। তেমনি আবার দিদিদের সঙ্গে পুতুলখেলাও চমৎকার লাগত। মা সুন্দর করে দোতলা পুতুল-ঘর সাজিয়ে দিয়েছিলেন...কত ডল-পুতুল, কাচের পুতুল, মাটির পুতুল, পুতুলের খাট-বিছানা, চেয়ার-টেবিল, টি-সেট, ডিনার-সেট, পিতল ও মাটির কত হাঁড়িকুড়ি হাতাবেড়ি কত ঘরকন্না রান্নাবান্না। দিদিরা সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় পুঁতির গয়না তৈরি করত, পুতুলের বিয়েতে ছোটো ছোটো পাতায় করে ছোটো ছোটো লুচি-মিষ্টি ইত্যাদি খাওয়া

হতো। একবার পুতুলের বিয়েতে আমরা ফুলপাতা নিশান দিয়ে বিয়েবাড়ি সাজিয়ে সারি সারি ছোট্ট ছোট্ট রঙিন মোমবাতি জ্বেলে দিলাম, সবাইকে ডেকে দেখালাম, কী সুন্দর দেখাচ্ছে। তারপর খাবার ডাক পড়তে সবাই নীচে চলে গেলাম। খাওয়া সেরে এসে দেখি, পুতুলঘরে সে এক অগ্নিকাণ্ড! ছোট্ট মোমবাতি কয়েক মিনিট জ্বলেই শেষ হয়ে গিয়েছে, নিশানটিশান পুড়ে এবারে কাঠের ছাত জ্বলতে আরম্ভ করেছে। তাড়াতাড়ি জল ঢেলে আগুন নিভানো হলো, অল্পের জন্য পুতুলগুলো বেঁচে গেল।

আমাদের এক মজার খেলা ছিল 'রাগ বানানো'। হয়তো কারো উপর রাগ হয়েছে অথচ তার শোধ দিতে পারছি না, তখন দাদা বলত, 'আয় রাগ বানাই!' বলেই সেই লোকটির সম্বন্ধে যা তা অদ্ভুত গল্প বানিয়ে বলতে আরম্ভ করত, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বলতাম। তার মধ্যে বিদ্বেষ কিংবা হিংস্র ভাব কিছু থাকত না, সে ব্যক্তির কোনো অনিষ্ট চিন্তা থাকত না, শুধু মজার মজার কথা। যত রকম বোকামি হতে পারে, যত রকমে মানুষ নাকাল ও অপ্রস্তুত হয়ে হাস্যাস্পদ হতে পারে সব কিছু সেই লোকটির সম্বন্ধে কল্পনা করে আমরা হেসে কুটিপাটি হতাম। দাদার 'হ-য-ব-র-ল' বইয়ের 'হিজি-বিজ-বিজ' যেমন 'মনে করো—' বলে যত রকম সব উদ্ভট কল্পনা করে নিজে নিজেই হেসে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম করে, আমাদেরও প্রায় সেই দশাই হতো। কিন্তু মজা হতো এই যে, হাসির স্রোতে রাগটাগ সব কোথায় ভেসে যেত—মনটা আবার বেশ হালকা খুশিতে ভরে উঠত।

আর একটা মজার খেলা ছিল, কবিতায় গল্প বলা। একটা কোনো জানা গল্প নিয়ে একজন প্রথম লাইনটা বানিয়ে বলবে, আরেকজনা তার সঙ্গে মিল দিয়ে দ্বিতীয় লাইন বলবে, তার পরের জন তৃতীয় লাইন, এমনি করে গল্পটা শেষ করতে হবে। যদি কেউ না পারে সে হেরে গেল, তার পরের জন বলবে। দাদা কখনও হার মানত না। যত শক্ত হোক না কেন চট করে মিলিয়ে দিত। যেমন একদিন হচ্ছে 'বাঘ ও বক'-এর গল্প---

'একদা এক বাঘের গলায় ফুটেছিল অস্থি।'

'যন্ত্রণায় কিছুতেই নাহি তার স্বস্তি।'

'তিন দিন তিন রাত নাহি তার নিদ্রা।'

'সেঁক দেয় তেল মাখে, লাগায় হরিদ্রা—'

এই রকম চলতে চলতে সুন্দরকাকা যেই বললেন—

‘ভিতরে ঢুকায়ে দিল দীর্ঘ তার চঞ্চু।’

কেউ আর তার মিল দিতে পারে না। আমরা সবাই ‘পাস’ দিয়ে দিলাম, দাদার পালা আসতেই সে চট করে বলল—

‘বক সে চালাক অতি চিকিৎসক-চুঞ্চু।’

আমরা চেঁচামেচি করে উঠলাম, ‘ওসব যা তা বললে হবে না। *চুঞ্চু* আবার কী কথা?’ সুন্দরকাকা খুশি হয়ে দাদার পিঠ চাপড়ে বললেন, ‘*চুঞ্চু* মানে ওস্তাদ, এক্সপার্ট।’

ছোটোবেলা থেকেই দাদা কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিল। আট বৎসর বয়সে তার প্রথম কবিতা ‘নদী’ আর নয় বৎসর বয়সে দ্বিতীয় ‘টিক টিক টং’ ‘মুকুল’ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

দাদার দেখাদেখি আমারও শখ হলো কবিতা লেখার। একটা খাতায় বেশ ফুল লতাপাতা এঁকে লুকিয়ে দুয়েকটা কবিতা লিখলাম, তারপর একটা গল্প লিখতে আরম্ভ করলাম। একদিন দুপুরে বসে গল্প লিখছি, বাবার কাছে একজন ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। তাঁকে বসিয়ে বাবাকে ডেকে দিলাম, বাবা এসে তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পসল্প করলেন, তারপর দুজনে একসঙ্গে কোথায় বেরিয়ে গেলেন। আমার খাতাটা টেবিলে ফেলে এসেছিলাম, ওঁরা চলে যেতেই তাড়াতাড়ি খাতাটা আনতে গিয়ে দেখি, আমার সেই অর্ধেক লেখা গল্পটার পাতায় ‘তারপর হলো কী’ বলে বাকি গল্পটা সেই ভদ্রলোক নিজেই লিখে শেষ করে রেখেছেন। তিনি ছিলেন তখনকার একজন নামকরা লেখক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত! বড়ো হয়ে তাঁর লেখা অনেক সুন্দর গল্প ‘প্রবাসী’-তে পড়েছি। আমার খাতায় তাঁর লেখাটা নিশ্চয়ই খুব ভালো হয়েছিল, কিন্তু তখন আমার মনে কী হয়েছিল জানো? মনে হলো, আমার গল্পটা মাটি হয়ে গেল! মনের দুঃখে খাতাটা ছিঁড়েই ফেললাম।

বাবা যখন বিদেশে কোথাও যেতেন, মজার মজার ছবি আর পদ্যে আমাদের চিঠি লিখতেন। আমাদের পড়া হয়ে গেলে সেগুলি কত লোকের হাতে হাতে ঘুরত। সেসব যদি সংগ্রহ করা থাকত, তাহলে তাই দিয়ে মজার একটা বই হতে পারত।

হাতে কলমে

পুণ্যলতা চক্রবর্তী (১৮৮৯-১৯৭৪) : প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কন্যা। *সন্দেশ* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে একদল নতুন লেখক তৈরি হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে পুণ্যলতা অন্যতম। তিনি শিশু ও কিশোরদের জন্য সহজ-সরল ভাষায় লিখেছেন। তিনি সুকুমার রায়, সুবিনয় রায়চৌধুরী, সুখলতা রাওয়ের সহোদরা। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— *ছেলেবেলার দিনগুলি, ছোট্ট ছোট্ট গল্প, রাজবাড়ি।*

১. পুণ্যলতা চক্রবর্তীর কয়েকজন ভাইবোনের নাম লেখো।

২. তাঁর লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

৩. **ক স্তম্ভের সঙ্গে খ স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো।**

ক	খ
উনুন	বাড়ি
পটগুলটিশ	গোবর
সিঁড়ি	বই
ঘুঁটে	আগুন
লেখাপড়া	খেলা

৪. **নীচের এলোমেলো শব্দগুলি সাজিয়ে লেখো :**

খা ড়া লে প / টি ল গু শ ট প

ঘ ল পু তু র / রা ক ম না / গ র গু রু ম্ভী

৫. **বন্ধনীর মধ্য থেকে ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে আবার লেখো :**

৫.১ মা সুন্দর করে (এক/দুই/তিন/চার) তলা পুতুলঘর সাজিয়ে দিয়েছিলেন।

৫.২ তোমাকে দেখছি এবার (সোনার/তামার/লোহার/টিনের) বালা গড়িয়ে দিতে হবে।

৫.৩ হাতকড়ি পরায় (চোর/উকিল/শিক্ষক/পুলিশ)।

৫.৪ হ য ব র ল হলো একটি (খেলনা/ট্রেন/গাছ/বই)।

৫.৫ (যোধপুরে/বিজাপুরে/ভাগলপুরে/মধুপুরে) সেই রেলগাড়ির কবিতা লিখেছিলেন।

৬. কোনটি বেমানান চিহ্নিত করো :

৬.১ ঘুঁটে/উনুন/ কামান/রান্নাঘর

৬.২ সিঁড়ি/চিলেকোঠা/বারান্দা/বাজার

৬.৩ আলমারি/হাতকড়ি/চোর/পুলিশ

৬.৪ জ্যাঠা/দাদা/বাবা/কাকা

৭. ঘটনাক্রম অনুযায়ী সাজাও :

৭.১ খাওয়া সেরে এসে দেখি, পুতুলঘরে সে এক অগ্নিকান্ড।

৭.২ দেখতে দেখতে ছাদটা কাদার ঘুঁটেতে ভরতি হয়ে গেল।

৭.৩ মনের দুঃখে খাতাটা ছিঁড়েই ফেললাম।

৭.৪ আর একটা মজার খেলা ছিল কবিতায় গল্প বলা।

৭.৫ অল্পের জন্য পুতুলগুলো বেঁচে গেল।

৮. শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

৮.১ জ্যেঠামশাইকেও বাড়ির ছেলেরা ভীষণ _________ করত।

৮.২ হঠাৎ _________ করে কী একটা তার পায়ের কাছে পড়ল।

৮.৩ একদা বাঘের গলায় ফুটে ছিল _________।

৮.৪ _________ মানে ওস্তাদ, এক্সপার্ট।

৮.৫ সেঁক দেয় তেল মাখে, লাগায় _________।

শব্দঝুড়ি
থ্যাপ, অস্থি,
ভয়, চুঞ্চু, হরিদ্রা

৯. একটি বাক্যে উত্তর দাও :

৯.১ পাঠে উল্লিখিত নতুন বাড়িটি কোথায় ছিল?

৯.২ সেই নতুন বাড়িতে কীসের অভাব ছিল না?

৯.৩ লেখিকা ও তার সঙ্গীরা কোথা থেকে গঙ্গামাটি জোগাড় করেছিলেন?

৯.৪ গঙ্গামাটি দিয়ে কী করা শুরু হলো?

৯.৫ রান্নাঘরে উনুনের মধ্যে কী গুঁজে রাখা হতো?

৯.৬ লেখিকার জ্যেঠামশাইয়ের গলার আওয়াজ কেমন ছিল?

৯.৭ লেখিকার জ্যেঠামশাই সম্পর্কে কী শোনা যেত?

৯.৮ বাড়ির চাকর সিঁড়ির আলোটা উসকিয়ে দেওয়ার পর কী দেখা গিয়েছিল?

৯.৯ ছোটোদের পুতুলের বিয়েতে কেমন খাওয়া-দাওয়া হতো?

৯.১০ দোতলা পুতুলঘর কে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছিলেন?

৯.১১ কোন খেলার সময় লেখিকা ও তাঁর ভাই-বোনদের মন হালকা খুশিতে ভরে উঠত?

৯.১২ কীভাবে লেখিকার বালা ভেঙে গিয়েছিল?

৯.১৩ পুতুলঘরে কীভাবে আগুন লেগেছিল?

৯.১৪ সুন্দরকাকা লেখিকার দাদার পিঠ চাপড়ে কী বলেছিলেন?

৯.১৫ লেখিকার দাদার প্রথম কবিতার নাম কী?

৯.১৬ তাঁর দ্বিতীয় কবিতাটি দাদা কত বৎসর বয়সে লিখেছিল?

৯.১৭ লেখিকার বাবা বিদেশ থেকে কী পাঠাতেন?

১০. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১০.১ কীভাবে পটগুলটিশ খেলা চলত?

১০.২ লেখিকার জ্যেঠামশাই কেমন মানুষ ছিলেন?

১০.৩ 'রাগ বানানো' খেলাটা কীভাবে খেলতে হতো?

১০.৪ কোন কোন খেলার কথা পাঠ্যাংশে খুঁজে পেলে?

১০.৫ কীভাবে পটগুলটিশের গুলি তৈরি হতো?

১০.৬ 'তোমাকে দেখছি এবার লোহার বালা গড়িয়ে দিতে হবে'।— একথা কে বলেছেন? কোন প্রসঙ্গে তাঁর এই উক্তি? বক্তাকে তোমার কেমন মনে হয়েছে।

১০.৭ মেয়েদের খেলাধুলোর কেমন ছবি পাঠ্যাংশে খুঁজে পেলে?

১০.৮ 'হ-য-ব-র-ল'-র স্রষ্টা কে? তাঁকে লেখিকা কী ভাবে স্মরণ করেছেন?

১১. জ্যেঠতুতো, পিসতুতো, মাসতুতো— এইসব সম্পর্ক ছাড়াও আরও অনেক সম্পর্ক আমাদের পরিবারগুলিতে থাকে। তুমি যে কয়টি সম্পর্কের নাম জানো সেগুলো লেখো।

শব্দার্থ : পাল্লা — প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। গুরুগম্ভীর — গভীর অর্থবিশিষ্ট। হাতেখড়ি — লেখা শেখার প্রথম অনুষ্ঠান। দস্যি — দুষ্টু, দামাল। নিশান — পতাকা, নিদর্শন। বিদ্বেষ — ঈর্ষা, হিংসা। হিংস্র — হিংসাকারী, ভয়ানক। হাস্যাস্পদ — হাসি বিদ্রূপের পাত্র। উদ্ভট — অদ্ভুত, আজগুবি। অস্থি — হাড়। স্বস্তি — আরাম। হরিদ্রা — হলুদ। চঞ্চু — পাখির ঠোঁট। প্রবাসী — বিদেশে থাকে যে।

১২. প্রতিশব্দ লেখো :

সাথী, বিশ্রাম, মজা, সিঁড়ি, রান্নাঘর, নিশান।

১৩. বর্ণবিশ্লেষণ করো :

অভাব, উনুন, আহত, টুকরো, মোমবাতি, চিঠি।

১৪. সন্ধিবিচ্ছেদ করো :

স্বস্তি, নগেন্দ্র, আরেক।

১৫. নীচের গদ্যটিতে যতিচিহ্ন ব্যবহার করো : ধমক দিয়ে বললেন এটা আবার কী কোত্থেকে এল চাকর কাঁচুমাচু হয়ে বলল আজ্ঞে ছেলেরা কী যেন খেলা করছিল।

১৬. পাশের প্রতিটি বিষয় নিয়ে পাঁচটি করে স্বাধীন বাক্য লেখো :

গয়না, পরিবার, ঘুঁটে।

১৭. বছরের কোন সময় কোন খেলা খেলতে তুমি ভালোবাসো সেই অনুযায়ী ছকটি পূরণ করো :

ঋতু	খেলা
গ্রীষ্মের সময়	
বর্ষার সময়	
শীতের সময়	
বসন্তের সময়	

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য

মুকুল — উনিশ শতকের শেষদিকে শিশুদের উপযোগী যে সব মাসিকপত্র প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে *মুকুল* অন্যতম। প্রখ্যাত সাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সম্পাদনায় *মুকুল* প্রকাশিত হতো। রচনার গুণে, সহজ-সরল ভাষায় এবং চোখ ভোলানো ছবির জন্য *মুকুল* সর্বপ্রথম শিশুদের জন্য প্রকাশিত মাসিকপত্রের জগতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।

প্রবাসী — ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *প্রবাসী* পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মাসিক পত্ররূপে *প্রবাসী*তে উপন্যাস, ছোটোগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হতো। এই পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের অজস্র রচনা। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নব্য ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ক রচনাগুলি *প্রবাসী*তে ছাপা হতো। সেকালের অনেক প্রখ্যাত সাহিত্যিক এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন।

হ য ব র ল — প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায় রচিত *হ য ব র ল* বাংলা সাহিত্যের একটি অসামান্য গ্রন্থ। সাধারণভাবে তাঁর লেখায় আজগুবি, উদ্ভট খেয়ালের পরিচয় মেলে। এই বইতে উদ্ভট কল্পনা আর বাস্তব জীবনকে চমৎকার ভাবে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন। কেবল শিশুরা নয়, সব বয়সের মানুষ সুকুমার রায়ের *হ য ব র ল* থেকে আনন্দ খুঁজে পায়।

মধুপুর — পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত *মধুপুর* স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে সুপরিচিত। মধুপুরের মনোরম পরিবেশ সকলকে আকর্ষণ করে। বহু বাংলা গল্প উপন্যাসে এবং লেখকদের অভিজ্ঞতায় পশ্চিমের জল-হাওয়ার কথা পাওয়া যায়। সেই পশ্চিমের অন্যতম একটি জনপদ মধুপুর।

তৃতীয় পাঠ

মা ল গা ড়ি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

চাই না আমি তুফান কী মেল ট্রেন,
মালগাড়ি হই একটি শুধু যদি
ঘটর ঘটর দিনরাত্তির চলি,
নেইকো তাড়া, যেন ভাটার নদী।

জন্মদিনে মিষ্টি একটা পরি
ভুলে যদি আসে আমার বাড়ি,
চেয়ে নেব একটি শুধু বর,—
বলব, ‘আমায় করো না মালগাড়ি।’

প্যাসেঞ্জার কী মেল ট্রেন সব যত
শুধু কাজের ধান্দা নিয়েই আছে,
স্টেশন পেলেই যাত্রী ওঠায় নামায়,
ভাবনা শুধু লেট হয়ে যায় পাছে।

আমার শুধু নিজের খুশির চলা,
দায় নেইকো টাইমটেবিল দেখার।
যত দূরে-ই যেখানে যাই নাকো
সারা লাইন শুধু আমার একার।
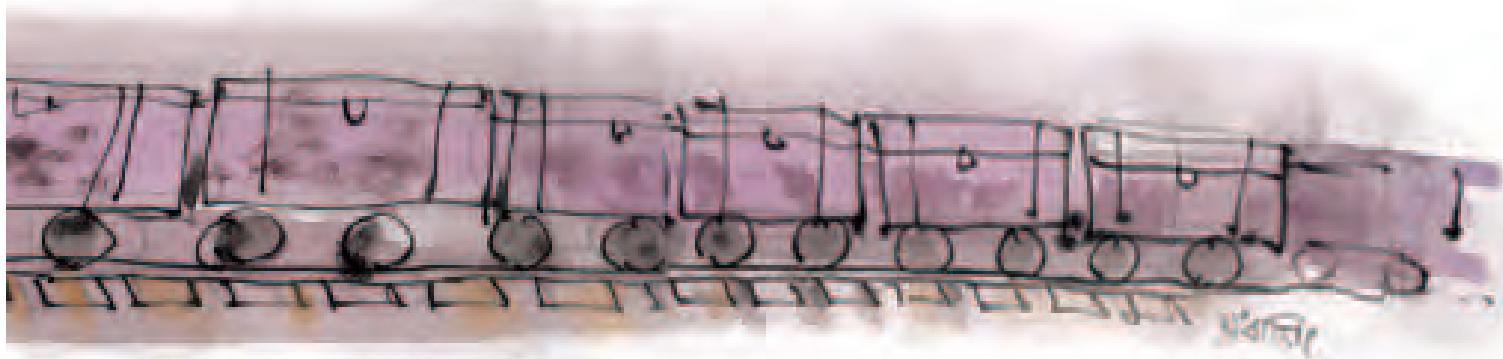
ট্রেনগুলো তো এক লাইনেই ছোটে,
যাওয়া-আসার বাঁধা ঠিক-ঠিকানা।
আমার জন্যে সব রাস্তাই খোলা
থামতে যেতে কোথাও নেই মানা।

ওরা যখন হাঁসফাঁসিয়ে মরে,
যাচ্ছি যাব করেই আমার যাওয়া।
ওরা শুধু পৌঁছোতে চায় ছুটে,
আমার সুখ তো অশেষ চলতে পাওয়া।

হাতে কলমে
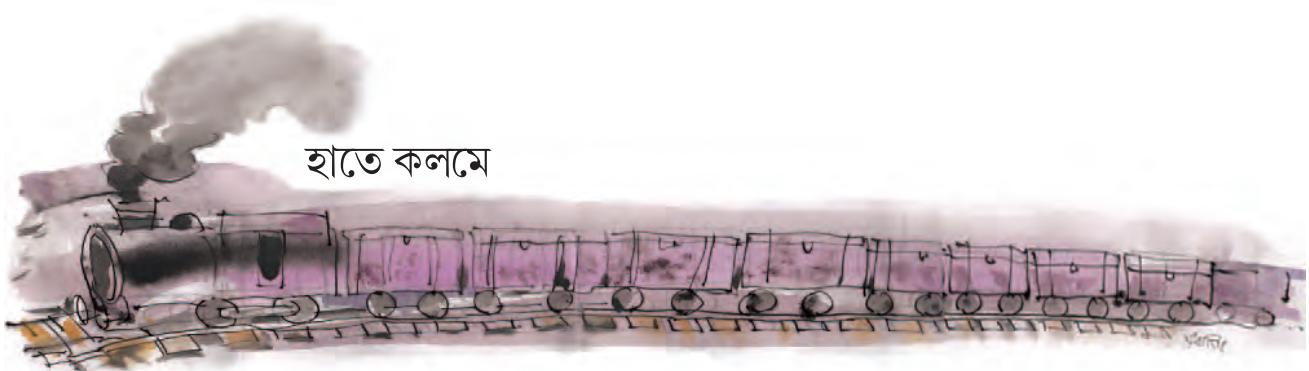
প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৩—১৯৮৮) : বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে গদ্যে এবং পদ্যে নতুন রীতি যাঁদের হাত ধরে শুরু হয়েছিল তাঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র অগ্রগণ্য। তিনি গল্প, কবিতা, উপন্যাস, শিশু-কিশোর সাহিত্য, নাটক, প্রবন্ধ এবং অনুবাদমূলক রচনা সব বিষয়েই ছিলেন সমান দক্ষ। *কালিকলম* পত্রিকার সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। *প্রথমা, সম্রাট, সাগর থেকে ফেরা, ফেরারি ফৌজ* ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ, *পাঁক, হানাবাড়ি, মিছিল, বিসর্পিল* ইত্যাদি উপন্যাস, *তেলেনাপোতা আবিষ্কার, শুধু কেরানি, শৃঙ্খল, হয়তো* ইত্যাদি ছোটোগল্প তিনি রচনা করেছেন। ছোটোদের জন্য নানান রকমের রহস্য গল্প এবং গোয়েন্দা কাহিনি লিখেছেন। *ঘনাদা* চরিত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। কবি তাঁর *সাগর থেকে ফেরা* কাব্যগ্রন্থের জন্য *রবীন্দ্র পুরস্কার* এবং *অকাদেমি পুরস্কার* পেয়েছিলেন।

১. প্রেমেন্দ্র মিত্র কোন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?

২. তাঁর সৃষ্ট একটি বিখ্যাত চরিত্রের নাম লেখো।

৩. **একটি বাক্যে উত্তর দাও:**

৩.১ 'মালগাড়ি'-র চলাকে কবিতায় কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

৩.২ কথকের জীবনে কোন বিশেষ দিনটিতে পরির সঙ্গে তার দেখা হতে পারে?

৩.৩ প্যাসেঞ্জার ট্রেন কোন কাজের ধান্দা নিয়ে থাকে?

৩.৪ 'মালগাড়ি' কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?

৩.৫ সত্যিই কি মালগাড়ির টাইমটেবিল অনুযায়ী চলার প্রয়োজন নেই?

৩.৬ প্যাসেঞ্জার বা মেল ট্রেনের তুলনায় মালগাড়ির ধীরগামী হওয়ার কারণ কী বলে তোমার মনে হয়?

৩.৭ আপ ট্রেন আর ডাউন ট্রেন বলতে কী বোঝায়?

৩.৮ তোমার জানা এমন কয়েকটি যানবাহনের নাম লেখো যেগুলি যাত্রীপরিবহণ করে না।

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ জোয়ার আর ভাঁটায় নদীর চেহারা কেমন হয়?

৪.২ এই কবিতায় পরিদের প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে? পরির প্রসঙ্গ তুমি এর আগে কোন কোন গদ্য, কবিতায় পড়েছ?

৪.৩ মালগাড়ি হয়ে কবিতার কথক কোন সুখ অনুভব করতে চায়?

৪.৪ কবিতায় 'ঘটর ঘটর' শব্দটি মালগাড়ির শব্দ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। তুমি এমন কিছু শব্দ লেখো যা দিয়ে যন্ত্র বা যানবাহনের শব্দকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

৫. **গদ্যরূপ লেখো :**

৫.১ মালগাড়ি হই একটি শুধু যদি ঘটর ঘটর দিনরাত্তির চলি।

৫.২ চেয়ে নেব একটি শুধু বর।

৫.৩ ভাবনা শুধু লেট হয়ে যায় পাছে।

৫.৪ যত দূরেই যেখানে যাই নাকো সারা লাইন শুধু আমার একার।

৫.৫ যাচ্ছি যাব করেই আমার যাওয়া।

শব্দার্থ : মেলট্রেন — দ্রুতগামী রেলগাড়ি। লেট — দেরি। পাছে — নয়তো। টাইম টেবিল — সময়সারণি। ঠিক-ঠিকানা — অনির্দিষ্ট। হাঁসফাঁসিয়ে — অস্থির হয়ে। অশেষ — শেষ নেই যার।

৬. **প্রতিটি শব্দের সমার্থক শব্দ লেখো ও সেগুলি বাক্যে ব্যবহার করো :**

বাড়ি, নদী, ভাবনা, খুশি, ধান্দা, তুফান, রাস্তা।

৭. **‘ভালো-মন্দ’ —এর মতো বিপরীত অর্থের শব্দ পাশাপাশি আছে এমন তিনজোড়া শব্দ কবিতা থেকে বের করে লেখো।**

৮. **ছক করে নীচের শব্দগুলি থেকে ঘোষ বর্ণ ও অঘোষ বর্ণ আলাদা করে বসাও :**

তুফান, দেখা, ছুটে, কাজ, মিষ্টি, যাত্রী।

৯. কবিতাটিতে যেকটি ইংরাজি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি হলো — মেলট্রেন, প্যাসেঞ্জার, স্টেশন, লেট, লাইন, টাইমটেবিল। শব্দগুলি প্রতিটিই রেলগাড়ি সংক্রান্ত। এবার তুমি বাস ও সেই সংক্রান্ত ইংরাজি শব্দগুলির একটি তালিকা তৈরি করো।

১০. তুমি একটি মালগাড়ি দেখতে পেলে। মালগাড়ি সম্বন্ধে তোমার মনে কী কী প্রশ্ন জেগেছে? তার অন্তত পাঁচটি প্রশ্ন খাতায় লেখো।

১১. নীচে একটি টাইমটেবিলের অংশ (নমুনা হিসেবে) তোমাদের জন্য দেওয়া রইল। সেখান থেকে বিভিন্ন ট্রেনের নম্বর, কোথা থেকে ছাড়ছে, গন্তব্যস্থলটি কোথায়, বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেনের পৌঁছোনোর সময় ইত্যাদি তোমার খাতায় নথিভুক্ত করো। (প্রয়োজনে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সাহায্য নাও)।

শেওড়াফুলি - তারকেশ্বর　　আপ

স্টেশন ↓		৩৭৩৬৫#	৩৭৪১১*	৩৭৩১১	৩৭৩৯৩	৩৭৩১৩	৩৭৩৬৭#	
হাওড়া	ছাঃ	০৪২২	——	০৫১০	০৫৩২	০৫৫৫	০৬৩২	
শেওড়াফুলি জং	ছাঃ	০৫০৩	০৫১৫	০৫৪৮	০৬১১	০৬৩৩	০৭১০	
দিয়ারা	ছাঃ	০৫০৮	০৫২০	০৫৫৩	০৬১৬	০৬৩৮	০৭১৫	
নসিবপুর	ছাঃ	০৫১১	০৫২৩	০৫৫৬	০৬১৯	০৬৪১	০৭১৮	
সিঙ্গুর	ছাঃ	০৫১৬	০৫২৮	০৬০১	০৬৩০	০৬৪৬	০৭২৩	
কামারকুণ্ডু জং	ছাঃ	০৫২১	০৫৩৩	০৬০৬	——	০৬৫১	০৭২৮	
নালিকুল	ছাঃ	০৫২৫	০৫৩৭	০৬১০		০৬৫৫	০৭৩২	
মালিয়া	ছাঃ	০৫২৯	০৫৪১	০৬১৪		০৬৫৯	০৭৩৬	
হরিপাল	ছাঃ	০৫৩১	০৫৪৩	০৬১৬		০৭০১	০৭৩৮	
কৈকালা	ছাঃ	০৫৩৫	০৫৪৭	০৬২০		০৭০৫	০৭৪২	
বাহিরখণ্ড	ছাঃ	০৫৩৯	০৫৫১	০৬২৪		০৭০৯	০৭৪৬	
লোকনাথ	ছাঃ	০৫৪৪	০৫৫৬	০৬২৯		০৭১৪	০৭৫১	
		০৫৪৯	০৬০৬	০৬৪৪		০৭২৫	০৮০৭	
তারকেশ্বর	পৌঃ	০৫৫১	——	——		——	০৮১৭	

তারকেশ্বর - শেওড়াফুলি জং　　ডাউন

স্টেশন ↓		৩৭৩২০	৩৭৩৮৬	৩৭৩২২	৩৭৩৬৮#	৩৭৩২৪	৩৭৩২৬	৩৭৩২৮	
তারকেশ্বর	ছাঃ	——		——	০৮৫৬	——	——	——	
	ছাঃ	০৭৫০		০৮২৫	০৯২৩	০৯৪৫	১০১৯	১১০৫	
লোকনাথ	ছাঃ	০৭৫৩		০৮২৮	০৯২৬	০৯৪৮	১০২২	১১০৮	
বাহিরখন্ড	ছাঃ	০৭৫৮		০৮৩৩	০৯৩১	০৯৫৩	১০২৭	১১১৩	
কৈকালা	ছাঃ	০৮০২	——	০৮৩৭	০৯৩৫	০৯৫৭	১০৩১	১১১৭	
হরিপাল	ছাঃ	০৮০৬	০৮২৫	০৮৪২	০৯৩৯	১০০১	১০৩৫	১১২১	
মালিয়া	ছাঃ	০৮০৯	০৮২৮	০৮৪৫	০৯৪২	১০০৪	১০৩৮	১১২৪	
নালিকুল	ছাঃ	০৮১২	০৮৩১	০৮৪৮	০৯৪৫	১০০৭	১০৪১	১১২৭	
কামারকুণ্ডু জং	ছাঃ	০৮১৭	০৮৩৬	০৮৫৪	০৯৫০	১০১২	১০৪৬	১১৩২	
সিঙ্গুর	ছাঃ	০৮২৫	০৮৩৯	০৮৫৭	০৯৫৩	১০১৫	১০৪৯	১১৩৫	
নসিবপুর	ছাঃ	০৮৩০	০৮৪৪	০৯০১	০৯৫৮	১০২০	১০৫৪	১১৪০	
দিয়ারা	ছাঃ	০৮৩৩	০৮৫০	০৯০৯	১০০১	১০২৩	১০৫৭	১১৪৩	
		০৮৪৫	০৯০৭	০৯২৩	১০২০	১০৪৪	১১১৬	১২০৪	
শেওড়াফুলি জং	পৌঃ	০৯২৩	০৯৪৮	১০০২	১১০২	১১২৭	১১৫৮	১২৪৭	

বনের খবর

প্রমদারঞ্জন রায়

লুশাই পাহাড়ের যে জায়গায় আমার কাজ ছিল সে বড়ো ভয়ংকর জায়গা। সাড়ে-ছশো সাতশো বর্গমাইল জায়গা, তার মধ্যে একটা গ্রাম নেই, পথ নেই। সঙ্গে প্রায় ষাটজন লোক, জিনিসপত্র। খোরাক ইত্যাদিও ঢের। সেসব বইবার জন্য দুটো হাতিও আছে।

দশ-বারোজন লুশাই বন কেটে পথ করে আগে আগে চলে, তবে আর সবাই এগোতে পারে। অত করেও, অত মেহনতের পরও একদিনে চার-পাঁচ মাইলের বেশি অগ্রসর হওয়া যায় না। সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন তাঁবু পড়ে, তখন কারো হাত-পা যেন চলতে চায় না। তার উপর আবার পাহারা দিতে হয়।

সে ঘোর বনে মানুষের নামগন্ধ নেই, শুধু জানোয়ারের কিলিবিলি! সন্ধ্যার পর পা ফেলতে গেলে মনে হয় এই বুঝি বাঘই মাড়ালাম।

বেলা নটা-দশটার আগে আর সূর্য দেখা যায় না। এক-এক জায়গায় এমনি ঘন বন যে আকাশ দেখবার জো নেই, ঠিক মনে হয় যেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আমি সকলের আগে আগে চলি, সঙ্গে

একজন বুড়ো লুশাই থাকে, সে বড়ো শিকারি। তার পিছনে দুজন খালাসি, তাদের মধ্যে শ্যামলালের হাতে আমার দূরবিন, বন্দুক আর টোটার থলে, অন্যজনের হাতে আমার খাবার আর জল। তিনজনের হাতেই এক-একখানি দা।

আমরা চারজনে গাছে দাগ কেটে অন্য সকলের আধ মাইল বা কিছু বেশি আগে আগে যাই, আর সেই দাগ দেখে লুশাই কুলিরা বন কেটে পথ তৈরি করে, হাতি আর বাকি লোকদের নিয়ে আসে। রোজই এমনি করে চলতে হয়। একদিন পনেরো-কুড়ি ফুট চওড়া একটা বুনো হাতিদের রাস্তা পাওয়া গেল, লোকজনদের খুব মজা, বন কাটতে হচ্ছে না।

চলতে-চলতে এক জায়গায় দেখলাম পথের উপর প্রকাণ্ড গাছ পড়ে রয়েছে। দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম আমাদের হাতি দুটো এ-গাছ ডিঙোবে কী করে? ভাবতে-ভাবতে গাছটার উপর চড়তে আরম্ভ করলাম, আর অমনি আমার পায়ের নীচেই যেন একটা কী হুড়মুড় করে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেয়া হ্যায় রে?' শ্যামলাল বললে, 'হুল্লুমান হোগা হুজুর।'

বলতে-না-বলতে সেটা গাছপালা ভেঙে কামানের গোলার মতো বেরিয়ে এল—গন্ডার! এক নজর আমাদের দিকে দেখেই 'ঘোঁৎ' বলে দৌড় দিল। আমি পিছনের দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছি শ্যামলাল বন্দুক দেবে, কিন্তু কোথায় শ্যামলাল! সে ততক্ষণে প্রাণ বাঁচাবার সোজা পথ খুঁজছে। গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে, শ্যামলালের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে, টোটা ভরে, গন্ডার মারতে ছুটলাম, কিন্তু ততক্ষণে গন্ডার কোথায় যে গা ঢাকা দিয়েছে, আর তাকে খুঁজে পেলাম না।

পরদিন খুব ভোরে উঠে চলতে আরম্ভ করেছি। আজকের পথ নালায়-নালায়, সঙ্গে বুড়ো লুশাই আর শ্যামলাল। ভোরবেলা নানারকম শিকার পাওয়া যায়, সেইজন্য বন্দুক ভরে নিয়েই চলেছি। শিকার সামনে পড়ছে কিন্তু মারতে পারছি না, একে ঘোর বন, তায় কুয়াশা। শিকার দেখতে-না দেখতে জঙ্গলে মিলিয়ে যায়। হাতি, গন্ডার, বাঘ, হরিণ, সকলেরই তাজা পাঞ্জা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। পাখিরও অভাব নেই, গোটা দুই ফেজেন্ট মেরেছি। হাতির পথ ধরে, নালাটাকে কখনো এপার কখনও ওপার করতে করতে পাকোয়া নদীর দিকে চলেছি, আজ রাত্রে সেখানে ক্যাম্প করব।

একটা শুকনো নালা সামনে পড়েছে, আমরা তার মধ্যে নামলাম, লুশাই বুড়ো আমার আগে আর শ্যামলাল পিছনে। শ্যামলাল তখনও নালার ভিতর নামেনি, আমরা নালা পার হয়ে উপরে উঠতে যাব, এমন সময় আমাদের সামনেই ভারী একটা জল-কাদা তোলপাড়ের শব্দ হলো। নিশ্চয় বুঝতে পারলাম হাতি, গন্ডার বা বুনো মোষ হবে, কাদায় লুকিয়ে আয়েস করছিল, আমাদের সাড়া পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমরাও তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত হয়ে, দুই লাফে নালার যে পার থেকে নেমেছিলাম সেখানে উঠে ফিরে চেয়ে দেখলাম ব্যাপারখানা কী। ব্যাপার গুরুতর! বিশাল-দেহ এক গন্ডার, যমদূতের

দাদামশায়ের মতো, দাঁড়িয়ে ফোঁস-ফোঁস করছে। লাল দুটো চোখ মিটমিট করছে, কান দুটো পিছন দিকে হেলানো। আমার পকেটে তিনটি মাত্র গুলিওয়ালা টোটা, মাঝে ফুট পনেরো চওড়া নালা, ওপারে গন্ডার, শ্যামলাল পালিয়েছে।

লুশাইটি ক্রমাগত বলছে, 'মারো সাহেব!' তার মুখে দাখানা, পা তুলে দিয়েছে গাছের গোড়ায়, বেগতিক দেখলেই বাঁদরের মতো চড়ে যাবে। আমি কী করব? সেই ছেলেবেলায় গাছে চড়তাম এখন সে বিদ্যা একেবারেই ভুলে গেছি, তার উপর পায়ে বুট! কাজেই ধীরে-ধীরে বন্দুকে গুলি ভরে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। গন্ডার যদি নালা পার হয়ে এপারে আসতে চায় তবেই গুলি চালাব, নইলে চালাব না।

লুশাই খালি বলছে 'মারো, মারো', কিন্তু তিনটি মাত্র গুলি সম্বল নিয়ে, গন্ডার মারতে গিয়ে শেষে কি প্রাণটা হারাব?

যাইহোক, আমাকেও গুলি চালাতে হলো না, লুশাই বুড়োকেও গাছে চড়তে হলো না, গন্ডারটা মিনিটখানেক পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থেকে, একটা হুংকার দিয়ে, দৌড়ে পাহাড়ে উঠে গেল। তার সামনে যত বাঁশ পড়ল, সমস্ত প্যাঁকাটির মতো পটপট করে ভেঙে গেল।

তখন আমরাও আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম। আধ মাইলও যাইনি, আবার সামনে ভীষণ হুড়োমুড়ি! তারপর মড়মড় করে বাঁশ ভাঙার শব্দ। তারপর, উঃ কী ভীষণ গর্জন! সারা বন থরথর করে কেঁপে উঠল। এবার একটু বেকায়দা, লুশাই বুড়োর আশে-পাশে গাছ নেই, কীসে চড়বে? শ্যামলাল হতভাগা ইতিমধ্যে এসে জুটেছে, টোটার থলে থেকে আট-দশটা গুলিভরা টোটা নিয়ে ইতিপূর্বেই পকেটে পুরেছি।

পথ ছেড়ে দিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে বন্দুক হাতে দাঁড়ালাম। দাঁতওয়ালা হাতি, হয় পাগল তা না হয় অন্য কোনো জানোয়ার দেখেছে। লুশাই বলল, 'বোধহয় সেই গন্ডারটা ওর সামনে পড়েছে।'

হাতিটা কিন্তু আমাদের দিকে এল না, তিন-চারটে ডাক দিয়ে, ধীরে-ধীরে বাঁশ ভাঙতে-ভাঙতে পাহাড়ে উঠল। আমরাও চলতে লাগলাম।

আমরা পাকোয়া নদীর কিনারায় পৌঁছোলাম। নদীটা সত্তর-আশি হাত চওড়া হবে, তাতে এক কোমর জল। নদীর ধারে হাতির পায়ের তাজা দাগ। একটার পিছনে একটা, তার পিছনে একটা, এমনি করে এক পাল হাতি গেছে। পায়ের দাগ দেখে আমি বললাম, 'পাঁচ-সাতটা হাতি হবে।'

লুশাই বুড়ো ভালো করে দেখে বলল, 'চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটার কম নয়। ঠিক দাগে-দাগে পা ফেলে গেছে বলে বোঝা যাচ্ছে না।'

সারাদিন জলে-জলে চলে আমার কাপড়-চোপড় সব ভিজে গিয়েছিল। আমি পাহাড়ে হেলান দিয়ে বসে জুতো-মোজা খুলতে আরম্ভ করলাম। লুশাইকে বললাম, 'ওপারে গিয়ে তাঁবুর জায়গা দেখো।'

লুশাই ওপারে চলে গেল, শ্যামলালও বন্দুক তার সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। আমি বসে-বসে 'হুঁ-উ-উ' করে পিছনের লোকদের ডাকতে বললাম, খাবারওয়ালা খালাসি তাদের সঙ্গে, আমার বেজায় খিদে পেয়েছে।

বার দুই ‘হুঁ-উ-উ’ করে চেঁচিয়েছি, অমনি আমার উপরের একটা পাহাড় থেকে একটা হাতি ‘হুঁ-উ-উ’ বলে ডেকে উঠল, আর আমার ওখান থেকে পঞ্চাশ-ষাট হাত দূরে আরও অনেক হাতি গুড়গুড় শব্দ করে তার জবাব দিতে লাগল। আমি আবার চেঁচালাম, হাতিগুলোও আবার ঠিক তেমনি করল। আবার চেঁচালাম, আবার তাই হলো। একটা হাতি পাহাড়ের উপর ‘হুঁ-উ-উ’ করে, আর বাকিগুলো নালার কিনারা থেকে গুড়গুড় শব্দ করে আর নাকে ফোঁসফোঁস আওয়াজ করে।

এমন সময় আমার মাথার উপর থেকে মড়মড় করে বাঁশ ভাঙবার আওয়াজ হতে লাগল আর নদীর ওপার থেকে শ্যামলাল আর লুশাই বুড়ো ব্যস্ত হয়ে আমাকে ডাকতে লাগল, ‘চলে এসো’। তিন-চারটে হাতি আমার চিৎকার শুনে দেখতে আসছে এ কী রকম জানোয়ারের ডাক, আমার মাথা থেকে বোধহয় ১০০-১২৫ গজ উঁচু পর্যন্ত নেমে এসেছে।

আমি তাড়াতাড়ি নদীর ওপারে গিয়ে, শ্যামলালের হাত থেকে বন্দুক নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। শ্যামলাল আর লুশাই বুড়ো খুব হল্লা জুড়ে দিল, তাই শুনে হাতিগুলো আবার পাহাড়ের উপর উঠে গেল। তারপর অনেকক্ষণ নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রইলাম, হাতি আর দেখতে পেলাম না, তবে ক্রমাগতই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম আর নদীর জল ঘোলাটে হয়ে উঠছিল।

চারটে সাড়ে-চারটের সময় অন্য লোকজন এসে পৌঁছোল। নদীর ওপারে বন কেটে তাঁবু খাটানো হলো, খুব বড়ো-বড়ো ধুনি আর পাহারার বন্দোবস্ত করা হলো। আগেই বলেছি আমাদের সঙ্গে দুটো হাতি ছিল, মাহুতরা রোজ তাদের চরে খাবার জন্য বনে ছেড়ে দেয়, সেদিন কিন্তু তাঁবুর কাছে বেঁধে রাখল। ছেড়ে দিলে বুনো হাতিতে এ-দুটোকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে, নয়তো মেরে ফেলবে। লুশাইরা শুকনো বাঁশের মশাল তৈরি করে, লম্বা লম্বা কাঁচা বাঁশের আগায় বেঁধে রাখল। রাত্রে হাতি এলে ওই মশাল জ্বেলে, তার লম্বা বাঁশের বাঁট ধরে ঘুরিয়ে হাতি তাড়াবে। এমনি করে লুশাইরা তাদের ক্ষেত থেকে হাতি তাড়ায়।

সে রাত্রে আর হাতির জ্বালায় ঘুম হয়নি। অন্ধকার হতেই হাতিগুলো আমাদের কাছে এল, আর বোধহয় ধুনির আলোতে আমাদের হাতি দুটোকে দেখতে পেয়ে তাদের ভারি খটকা লাগল, ও-দুটো আবার ওখানে কী করছে! পাঁচ-সাতটা হাতি মিলে এপারে আসবার জন্য এক-একবার নদীতে নামে, তারা নদীর মাঝামাঝি আসতে-না-আসতেই আমাদের হাতি দুটো ছটফট করে আর চিৎকার করতে আরম্ভ করে। অমনি আমাদের লোকরাও প্রাণপণে মশাল ঘুরিয়ে বিকট চিৎকার করতে-করতে ছুটে আসে আর হাতিগুলো দৌড়ে আবার ওপারের বনে ঢোকে। সারাটা রাত এইভাবে কাটল। ভোরবেলা কতকগুলো হাতি পুবের পাহাড়ে আর কতকগুলো পশ্চিমের পাহাড়ে উঠে গেল।

হাতে কলমে

প্রমদারঞ্জন রায় (১৮৭৪–১৯৪৯) : জন্ম ময়মনসিংহের মসুয়ায়। পিতা কালিনাথ রায়। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাঠ অসম্পূর্ণ রেখেই ভারতীয় জরিপ বিভাগের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে অফিসার পদে চাকরি পান। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভারত, বর্মা, শ্যামদেশের ঘন জঙ্গলে ঘুরেছেন। *বনের খবর* বইতে তাঁর চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতার কথা রয়েছে। তিনি স্বনামধন্য লেখিকা লীলা মজুমদারের পিতা এবং উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অনুজ।

১. প্রমদারঞ্জন রায় চাকরি সূত্রে কোন কোন দেশে ঘুরেছেন?

২. লীলা মজুমদার তাঁর কে ছিলেন?

৩. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :**

ক্রমাগত, পাঞ্জা, পশ্চিম, কিলিবিলি, প্রাণপণ।

৪. **'বনের খবর গল্পটিতে এমন অনেক শব্দ আছে যা হাইফেন (–) দিয়ে যুক্ত। যেমন 'সাড়ে ছশো-সাতশো 'দশ -বারোজন' ইত্যাদি। গল্পটিতে এরকম কতগুলো শব্দ আছে খুঁজে বার করে নীচের বাক্সটি ভরতি করো :**

৫. **ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি ব্যবহার করে মৌলিক বাক্যরচনা করো :**

কিলিবিলি, হুড়মুড়, মিটমিট, পটপট, মড়মড়, থরথর, গুড়গুড়, ফোঁসফোঁস

৬. **একই শব্দ পরপর দু-বার ব্যবহৃত হয়েছে এমন কয়টি শব্দ তোমরা গল্পে খুঁজে পেয়েছ তা লেখো :**

যেমন — *জলে-জলে*।

শব্দার্থ : বর্গমাইল — বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ক্ষেত্রফল মাপার একটি একক। খোরাক — খাদ্যদ্রব্য। মেহনত — পরিশ্রম। হুল্লুমান — 'হনুমান' শব্দটির রূপভেদ। পাঞ্জা — পাঁচ আঙুলসমেত করতল। ধুনি — অগ্নিকুণ্ড। খটকা — সন্দেহ, সংশয়।

৭. **নীচের অনুচ্ছেদে কয়টি বাক্য আছে লেখো :**

বেলা নটা - দশটার আগে আর সূর্য দেখা যায় না এক এক জায়গায় এমনি ঘন বন যে আকাশ দেখবার জো নেই ঠিক মনে হয় যেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে আমি সকলের আগে আগে চলি সঙ্গে একজন বুড়ো লুশাই থাকে সে বড়ো শিকারি তার পিছনে দু-জন খালাসি তাদের মধ্যে শ্যামলালের হাতে আমার খাবার আর জল তিনজনের হাতেই এক এক খানি দা।

৮. গল্পটিতে কোন কোন পশু-পাখির উল্লেখ আছে তার একটি তালিকা তৈরি করো। প্রতিটি পশু এবং পাখি সম্পর্কে দুটি করে বাক্য লেখো :

৯. **নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

৯.১ লুশাই পাহাড়ের বিস্তার কতখানি জায়গা নিয়ে?

৯.২ লুশাই পাহাড়কে ভয়ংকর জায়গা কেন বলা হয়েছে?

৯.৩ হাতির রাস্তা পাওয়া গেলে লোকজনের কেন খুব মজা হলো?

৯.৪ গন্ডার দেখে শ্যামলাল কী কী করেছিল?

৯.৫ দ্বিতীয় দিন বন্দুক এবং বনের পশুপাখি থাকা সত্ত্বেও শিকার করতে পারা যায় নি কেন?

৯.৬ পাকোয়া নদীর বর্ণনা দাও।

৯.৭ লেখকের হুঁ-উ-উ চিৎকার শুনে হাতিরা কী করেছিল?

৯.৮ রাতে কোথায় তাঁবু খাটানো হলো?

৯.৯ মাহুতরা রাতে কোথায় হাতিদের বেঁধে রাখল?

১০. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তব নিজের ভাষায় লেখো :**

১০.১ কীভাবে রাতে বুনো হাতি তাড়ানো হলো?

১০.২ লেখকের শুকনো নালায় নামার অভিজ্ঞতা নিজের ভাষায় লেখো।

জেনে রাখো :

একসময় পশুশিকার যেমন মানুষের শখ ছিল, তেমনই নগরায়ণের প্রয়োজনে কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেল-সড়ক প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রাণ বাঁচাতে মানুষকে পশুপাখি শিকার করতে হয়েছে। পাঠ্যের লেখক জরিপের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় শিকার করতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯৭২ সালে ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন তৈরি হয়। তখন থেকে যেকোনো রকমের পশুশিকার আইনত নিষিদ্ধ। কিন্তু শিকার কাহিনি সাহিত্যের একটি বিশেষ সংরূপ। যেমন ইংরেজিতে লেখা জিম করবেটের রচনা। ঠিক তেমনই বাংলায় প্রমদারঞ্জন রায়ের লেখা *বনের খবর।*

মিলিয়ে পড়ো

পূর্ব পাঠে পড়েছ কর্মসূত্রে লেখকের দেশ-বিদেশের জঙ্গলের অভিজ্ঞতার কথা। এবার পড়ে দেখো দুঃসাহসিক অভিযাত্রী বিমল মুখার্জির সাইকেলে চড়ে পৃথিবী ভ্রমণের সূচনা-পর্বের অভিজ্ঞতার কথা।

দু-চাকায় দুনিয়া

বিমল মুখার্জি

আজ থেকে ঠিক বাহান্ন বছর আগে মা-বাবা-ভাই-বোন আত্মীয়-বন্ধু ও ঘর-বাড়ি ছেড়ে আরামহীন অনিশ্চিতের পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম অজানাকে জানার ও অচেনাকে চেনার জন্য। সারা পৃথিবী ঘোরবার স্বপ্ন যা ছেলেবেলায় ভূগোল পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নেশার মতো আমাকে আঁকড়ে ধরেছিল, ১৯২৬ সালের ১২ ডিসেম্বর, তার বাস্তব রূপ নেওয়ার পথের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হলো। আমার বয়স তখন তেইশ, সঙ্গে তিন বন্ধু — অশোক মুখার্জি, আনন্দ মুখার্জি ও মণীন্দ্র ঘোষ। অশোক মুখার্জি আমাদের দলের নেতা। সাইকেল চারখানা আমাদের বাহন।

যাত্রা শুরু হলো কলকাতার টাউন হল থেকে। মহা আড়ম্বরে বিরাট এক জনসভার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রথম ভারতীয় দল ভূপর্যটক হয়ে পথে বেরোবে, এই খবরটা বাঙালির মনে সেদিন এক বিপুল উদ্দীপনা ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল।

টাউন হলের বাইরে এসে দেখি সামনে বিরাট জনসমুদ্র।

রাত ৯টার সময় পৌঁছোলাম চন্দননগরে। পরদিন বর্ধমান যাবার কথা ঠিক হলো।

বারোটার সময় আবার শুরু হলো জিটি রোড ধরে বর্ধমানের দিকে এগোনো।

১৯২৬ সালে জি টি রোড অনেক চওড়া ছিল। মোরাম দিয়ে বাঁধানো রাস্তা। দু-ধারে বড়ো বড়ো গাছের ছায়া সারাদিন থাকত। গাছের নীচ দিয়ে গোরুর গাড়ির সার দু-দিকে চলত। ক্বচিৎ কখনও একটা মোটরগাড়ি দেখেছি। ট্রাকে মাল বহনের রীতি তখনও হয়নি।

সর্বত্র আদর-আপ্যায়নের ভিতর দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। মোগল সাম্রাজ্য কায়েমি হওয়ার আগে পাঠান বীর শেরশাহ কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত ১৫০০ মাইল লম্বা এক চওড়া রাস্তা — গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড তৈরি করেছিলেন। অফুরন্ত ফলের গাছ তার দু-ধারে লাগানো। প্রত্যেক দশ মাইল অন্তর একটা পাকা কুয়ো বা ইঁদারা সংলগ্ন পান্থশালা। পঞ্চাশ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের জিটি রোডের পাশে যে কুয়ো ছিল আমরা তার সুগভীর ঠান্ডা জল খেয়ে আনন্দ লাভ করেছি।

আমরা জিটি রোড ছেড়ে রাঁচির পথ ধরলাম।

অশোক ও আনন্দ সম্পর্কে জ্যেঠতুতো-খুড়তুতো ভাই। ওদের আত্মীয়স্বজনের কাছে বিদায় নেওয়া উদ্দেশ্য ছিল।

রাঁচি ছেড়ে আমরা আবার জিটি রোডের দিকে এগোলাম, পালামৌ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। এদিকে কম লোক চলে — গাড়ি তো নেই। খয়ের গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমন কোনো ছোটো-বড়ো জন্তু-জানোয়ার ছিল না যাদের এই জঙ্গলে দেখা যেত না। বাঘ, হরিণ, নীলগাই আশপাশেই ঘুরত। সব মিলে জঙ্গলটা অপূর্ব সুন্দর দেখাত। রাত্রে ক্লান্ত হয়ে একটা ইনস্পেকশন বাংলোতে উঠলাম। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই চৌকিদার তার বাড়িতে চলে গিয়েছিল। দোর খুলে ভিতরে ঢুকতে খুব বেগ পেতে হয়নি। আমাদের সঙ্গে অ্যাসিটিলিন আলো ছিল। তার সাহায্যে একটা ঘর সাফ করে নিয়ে আমাদের সঙ্গে যা খাবার ছিল তা শেষ করে শুয়ে পড়লাম।

ঘরের সামনে যে উঠোন ছিল গভীর রাত্রে সেখানে এক ব্যাঘ্র মহাশয় আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলেন। আমরা দরজা ও জানালা একটু মজবুত করে আটকে চারজন চারদিকে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাঘ বাড়িটা প্রদক্ষিণ করল, কখনও কখনও দেয়ালের ওপারে জানোয়ার এপারে আমরা। জানালার মধ্যে কোথাও ফাঁক খুঁজছিল বোধহয়, আঁচড়ের শব্দে তাই মনে হলো। একটু জোরে ধাক্কা মারলেই জানালার খিলসুদ্ধ উড়ে যেত। সৌভাগ্যক্রমে বাঘের সেরকম মতিগতি ছিল না, তবু একবার জানালার কাছে বাঘ আসা মাত্র অশোক ০.৪৫ পিস্তল থেকে একটা গুলি ছুড়ল, কী সাংঘাতিক আওয়াজ। বাঘের কানে তালা লাগাবার মতো শব্দ। বাকি রাতটুকু আর আমাদের জ্বালাতন

না করে বাঘ উঠোন দিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। চাঁদনি রাতের আলোতে দেখলাম বাঘের পুরুষ্ট দেহটা। আওয়াজে ভয় পেয়ে সেখান থেকে সরে পড়াই শ্রেয় মনে করেছিল। তবু আমাদের কারো ঘুম হলো না। ভোরবেলায় চৌকিদার এসে হাজির। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল বাঘটার গুলি লেগেছে কিনা। আমরা ভয় পাওয়াবার জন্য আওয়াজ করেছিলাম শুনে বলল বাঘটা নাকি রোজ রাতে বাংলোয় বেড়াতে আসে। দিনের বেলায় যখন সে দেখেছে তার কাছে তখন সম্বল মাত্র একটা লাঠি। মানুষ খেকো নয় বোধহয়। খাবারের খোঁজেই টহল দিয়ে যায়।

আমরা চা খেয়ে রওনা হলাম জঙ্গলের পথ ধরে যতক্ষণ না আবার জিটি রোডে এসে পড়লাম। বিহারের চওড়া রাস্তার দু-পাশে ধান ও গম কাটা তখন হয়ে গিয়েছে। এই সময় কী পরিমাণ ব্ল্যাক বাক ও স্পটেড ডিয়ার দলে দলে দু-ধারে দেখা যেত, আজকের দিনে তা গল্পকথা বলে মনে হবে। সারস পাখিরা মাঠের উপর খাবার খুঁজে খেত। একেকটা গাছ ভরতি ফ্লেমিঙ্গো — কখনো কখনো হেরন পাখিও দেখা যেত। সারাটা রাস্তাজুড়ে অগণিত ঘুঘু দেখা যেত। তার কারণ গোরুর গাড়ি ভরতি চাল-ডাল-গম নিয়ে যাওয়ার সময় ফুটো থলে দিয়ে বাইরে কিছু পড়ত।

এইরকম পশুপাখি সারা জিটি রোডে দেখতাম। উত্তরপ্রদেশে ময়ূর দেখেছি যেখানে সেখানে। কেউ তাদের মারত না—এত সুন্দর জীব বলে। আখের ক্ষেতের আশেপাশে মস্ত বড়ো নীলগাই ও ময়ূর, হরিণও অনেক দেখেছি।

বিচিত্র সাধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি যখন পাঠশালাতে যাই
আমাদের এই বাড়ির গলি দিয়ে,
দশটা বেলায় রোজ দেখতে পাই
ফেরিওলা যাচ্ছে ফেরি নিয়ে
'চুড়ি চা—ই, চুড়ি চাই' সে হাঁকে,
চিনের পুতুল ঝুড়িতে তার থাকে,
যায় সে চলে যে পথে তার খুশি,
যখন খুশি খায় সে বাড়ি গিয়ে।
দশটা বাজে, সাড়ে দশটা বাজে,
নাইকো তাড়া হয় বা পাছে দেরি।
ইচ্ছে করে সেলেট ফেলে দিয়ে
অম্‌নি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি॥

আমি যখন হাতে মেখে কালি
ঘরে ফিরি, সাড়ে চারটে বাজে,
কোদাল নিয়ে মাটি কোপায় মালি
বাবুদের ওই ফুল-বাগানের মাঝে।
কেউ তো তারে মানা নাহি করে
কোদাল পাছে পড়ে পায়ের পরে।
গায়ে মাথায় লাগছে কত ধুলো,
কেউ তো এসে বকে না তার কাজে।
মা তারে তো পরায় না সাফ জামা,
ধুয়ে দিতে চায় না ধুলোবালি।
ইচ্ছে করে, আমি হতেম যদি
বাবুদের ওই ফুল-বাগানের মালি॥

একটু বেশি রাত না হতে হতে
মা আমারে ঘুম পাড়াতে চায়,
জানলা দিয়ে দেখি চেয়ে পথে
পাগড়ি পরে পাহারওলা যায়।
আঁধার গলি, লোক বেশি না চলে,
গ্যাসের আলো মিট্‌মিটিয়ে জ্বলে,
লন্ঠনটি ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে
দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির দরোজায়।
রাত হয়ে যায় দশটা-এগারোটা
কেউ তো কিছু বলে না তার লাগি।
ইচ্ছে করে পাহারওলা হয়ে
গলির ধারে আপন মনে জাগি॥

হাতে কলমে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১) : জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। অল্পবয়স থেকেই ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। *কথা ও কাহিনী*, *সহজপাঠ*, *রাজর্ষি*, *ছেলেবেলা*, *শিশু*, *শিশু ভোলানাথ*, *হাস্যকৌতুক*, *ডাকঘর*, *গল্পগুচ্ছ*-সহ তাঁর বহু রচনাই শিশু-কিশোরদের আকৃষ্ট করে। দীর্ঘ জীবনে অজস্র কবিতা, গান, ছোটোগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে 'Song Offerings'- এর জন্যে। দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত আর বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা। পাঠ্যাংশটি তাঁর *শিশু* নামক বই থেকে নেওয়া হয়েছে।

১. সহজপাঠ বইটির লেখকের নাম কী?

২. কবি রবীন্দ্রনাথ কত সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান?

৩. **একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৩.১ 'পাঠশালা' শব্দটির একটি সমার্থক শব্দ লেখো।

৩.২ কবিতার কথক বাড়ির গলি দিয়ে কোথায় যায়?

৩.৩ পাঠশালায় যাওয়ার পথে কথকের মনে কোন কল্পনা জেগে ওঠে?

৩.৪ সারাদিনের শেষে বাড়ি ফেরার পথে সে কী দেখতে পায়?

৩.৫ 'ফেরিওলা' 'মালি' কিংবা 'পাহারওলা'-র জীবনের স্বাধীনতা কথককে কীভাবে আকর্ষণ করে?

৩.৬ রাতের বেলা জানলা দিয়ে বক্তা কাকে দেখে?

৪. **তিন-চারটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৪.১ মালির জীবনের সঙ্গে বক্তার নিজের জীবনের অমিলগুলি কী?

৪.২ ফেরিওলার জীবনের কোন বিষয়গুলি বক্তাকে আকর্ষণ করে?

৪.৩ বক্তার দৃষ্টি অনুযায়ী রাতের দৃশ্য বর্ণনা করো।

৩.৭ কবিতায় কথকের নানরকম সাধের যে পরিচয় পাও তা উল্লেখ করো।

৫. **বাক্যরচনা করো :** কোদাল, পাগড়ি, গলি, খুশি, ফেরিওলা

৬. এই কবিতায় এক শিশুর অনেক সাধের কথা আছে। তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই লেখা যে কবিতায় ফুল, প্রদীপের আলো, পুকুরের জল এদের সাধের কথা আছে সেই কবিতাটির বিষয়ে নিজের ভাষায় ছয়টি বাক্য লেখো। এখানে প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকার সাহায্য নাও।

৭. **'ওলা / ওয়ালা' যোগে পাঁচটি শব্দ তৈরি করো : যেমন — 'ফেরিওলা', 'বাঁশিওয়ালা'।**

শব্দার্থ : ফেরি — পথে ঘুরে জিনিস বিক্রয়। সেলেট — 'শ্লেট'-এর কোমল রূপ। মানা — বারণ/নিষেধ। সাফ — পরিষ্কার। পাঠশালা — বিদ্যালয়। গলি — সরু রাস্তা। পাগড়ি— মাথায় জড়াবার কাপড়। কোপায়— কোপ দিয়ে কাটে। মালি— বাগানের গাছ-পালার পরিচর্যাকারী।

৮. **সূত্র অনুযায়ী শব্দছকটি পূরণ করো :**

পাশাপাশি

১। মাটি কাটার উপকরণ

৫। ঘরের ____ মাঝে মাঝে ঝাড়তে হয়

৮। যে পাহারা দেয়

১০। বিলম্ব

১১। পরিষ্কার পোশাক

১৩। জন্য

উপর- নীচ

১। মাটি কাটে

২। বাতি

৩। অন্ধকারকে দূর করে

৪। যে বাগানের কাজ করে

৬। উদ্যান

৭। এখন ____ ১২ টা

৮। বিদ্যালয়

৯। যে ফেরি করে বেড়ায়

১২। মৃত্তিকা

সমাধান:

পাশাপাশি : ১. কোদাল ৫. ধুলোবালি ৮. পাহারওলা ১০. দেরি ১১. সাফজামা ১৩. লাগি।

উপরনীচ : ১. কোপায় ২. লণ্ঠন ৩. আলো ৪. মালি ৬. বাগান ৭. বেলা ৮. পাঠশালা ৯. ফেরিওলা ১২. মাটি।

৯. নীচের বাক্যগুলি থেকে কর্তা, কর্ম এবং ক্রিয়া নির্দিষ্ট স্থানে বসাও :

৯.১ মা তারে তো পরায় না সাফজামা

৯.২ চিনের পুতুল ঝুড়িতে তার থাকে।

৯.৩ জানালা দিয়ে দেখি চেয়ে পথে।

৯.৪ ইচ্ছে করে পাহারাওয়ালা হয়ে গলির ধারে আপন মনে জাগি।

কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া

১০. কবিতার কথক কোন সময়ে কী কী ঘটতে দেখে তা লেখো। আর একই সঙ্গে ঠিক এই সময়গুলোতে তুমি কী করো এবং কী ঘটতে দেখো লেখো।

১১. তুমি তোমার গ্রামে বা শহরে যে নানারকম জীবিকার মানুষদের দিনের বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ কাজ করতে দেখো তার একটি তালিকা তৈরি করো। জীবিকার প্রয়োজনে তাঁদের বিশেষ রকমের হাঁক-ডাক ও ভঙ্গিমা লক্ষ করে লেখো।

১২.

পরপর তিনটি ছবিতে
তিনজন কর্মরত মানুষের
কথা আছে। তোমার কী
হতে সাধ হয় এবং কেন, তা
ছবি দেখে নিজের ভাষায়
কয়েকটি বাক্যে লেখো।
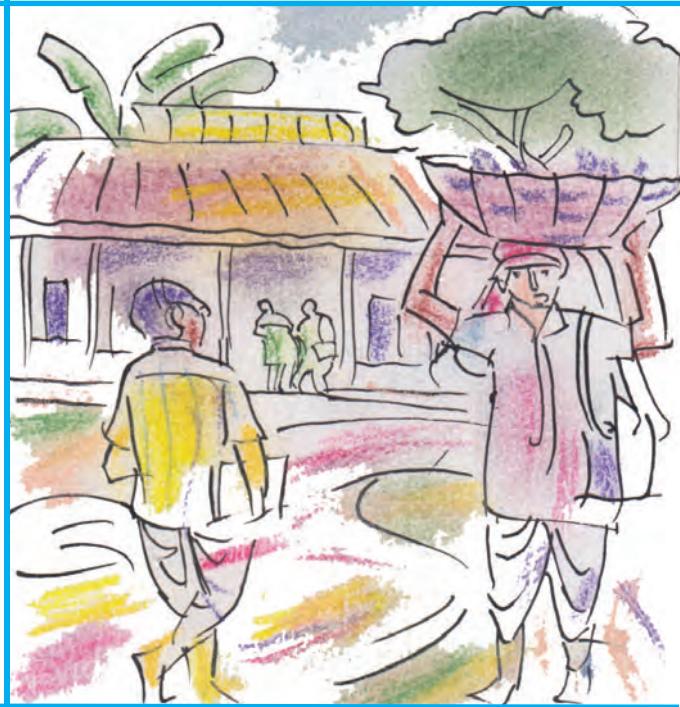
আমাজনের জঙ্গলে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

এমন জঙ্গল, এমন নদী, এমন চাঁদ, এমন মানুষজন — কাকারা সঙ্গে থাকলে আমার তো দেখাই হতো না! আর কোনো দিন বাড়ি ফিরতে পারব কিনা সেই ভয়ানক দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও কী করে আমার কাকাদের কথাটা এভাবে মনে এল জানি না।

আমাদের একেবারে সামনের নৌকো থেকে ভারি সুরেলা বাজনা ভেসে আসছিল। হঠাৎ থেমে যেতেই উবা জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বেশ খানিকটা জায়গায় সতর্ক চোখ বোলাতে লাগল।

দুয়েক মিনিটের মধ্যেই কাছে দূরে সব কটা নৌকোর গান-বাজনা থেমে গেল। আকাশে বিরাট চাঁদ, নীচে বিশাল নদী, মধ্যিখানে অদ্ভুত স্তব্ধতা।

সেই স্তব্ধতার মধ্যে উবার ফিশফিশ গলা শুনতে পেলাম — বোতো! বোতো!

তার বলার ভঙ্গি, চোখ-মুখের ভাব আর জলের দিকে আঙুল দেখানো থেকে বুঝলাম, উবা বলতে চাইছে বোতোকে দেখা যাচ্ছে!

বোতোর দেখা পাওয়া নাকি সবসময়ই ভালো, নৌকো উৎসবের রাতে দেখা পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের লক্ষণ।

উবা আমাকে বুঝিয়ে দিল নৌকোয় নৌকোয় গান-বাজনা থেমে যাওয়া মানে সকলে এতক্ষণে বোতোর দেখা পাওয়ার কথা জেনে গেছে। একটা নৌকোয় গান-বাজনা থামলেই বাকিরা যারা যত আগে সেটা খেয়াল করবে তারা তত আগে তাদের নৌকোর গান-বাজনা থামাবে। এভাবে কোনো একটা নৌকো থেকে বোতোর দেখা পাওয়ার দুয়েক মিনিটের মধ্যেই সব নৌকোয় সেই সুখবর ছড়িয়ে যায়। তখন সকলেই গান-বাজনা থামিয়ে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে চারিদিক থেকে গোল হয়ে প্রথম নৌকোটার কাছে ফিরে আসতে থাকে।

অন্যদের আর কথা কী, আমি নিজেও বোতোকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম। বোতোই নাকি আমাজনের বিপদ-আপদে মানুষকে রক্ষা করে! জলের তলায় তার মস্ত শহর, সেখানে রঙিন পাথরে তৈরি তার বিরাট প্রাসাদ!

হঠাৎ উবার ইশারায় নদীর জলে তাকিয়ে দেখি, খুব লম্বা মতো একটা প্রাণী তিন-চার হাত জলের নীচে ধীরে ধীরে এঁকে বেঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তার নাক বা ঠোঁট খুব সরু, লম্বায় প্রায় এক-দেড় হাত। মস্ত বড়ো মাথা, এর মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে বড়ো হলে আশ্চর্যের কিছু নেই। এর ল্যাজটা শরীরের শেষ প্রান্ত থেকে দু-দিকে ভাগ হয়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। রংটা ঠিক লাল কী? মনে হলো যেন গোলাপির দিকেই।

যদি ডলফিন হয়, তাহলে পূর্ণিমা রাতে আমাজন নদীতে ডলফিন দেখাও তো ভাগ্যের কথা, ক-জনের সে ভাগ্য হয়? আর যদি আমাজনের দেবতা হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমার মনের কষ্ট আর প্রার্থনা বোতোর অজানা থাকবে না! জলের নীচে বোতোকে দেখতে দেখতে আমি মনে মনে বললাম, বোতো, তুমি কে, আমি জানি না। তুমি যদি সত্যিই আমাজনের রক্ষাকর্তা হও, তুমি আমাকে আমার মা বাবা আর স্কুলের বন্ধুদের কাছে ফিরে যাওয়ার উপায় করে দিও।

একটা ভারি আশ্চর্য ব্যাপার চারদিক থেকে অতগুলো নৌকো একেবারে কাছে এসে ঘিরে ধরেছে, তবু বোতোর কোনো রাগ ভয় বিরক্তি নেই, সে আপনমনে আনন্দে মশগুল হয়ে খুব ধীরে ধীরে জলের মাত্র তিন-চার হাত নীচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনো কখনো জলের ওপরেও উঠে আসছে, সবসময়ই আনন্দে বিভোর, মনে হয় সে যেন তার মনের ভিতরের সুরে তালে ছন্দে লয়ে নেচে বেড়াচ্ছে।

জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে উবা একেকদিন হঠাৎই হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে। তারপর আমাকেও বসতে বলে। তার গভীর চোখ দুটি আমার দু-চোখের ওপর মেলে রেখে অনেকক্ষণ ধরে কী দেখে সে-ই জানে। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আমার চোখের মধ্যে দিয়ে বহু দূরের কিছু সে দেখছে বা দেখবার চেষ্টা করছে।

বেশ কিছু দিন এরকম হওয়ার পর, একদিন সকালে উবা একইভাবে হাঁটু গেড়ে বসে আমার চোখে চোখ রেখে মাটির ওপর তার কাঠকুটোর ছবি তৈরি করতে লাগল।

ছবি দেখে আমি বুঝলাম, উবা আমার চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে চায়, আমি কে? জানতে চায় আমি কোথা থেকে এসেছি। কোন পৃথিবীর মানুষ আমি, সেই পৃথিবীটা কীরকম?

এ প্রশ্নের উত্তর আমি কীভাবে বোঝাব জানি না। ভাবলাম, যে কলকাতায় আমরা থাকি, সেই কলকাতার কথাই ওকে বলি। শেষপর্যন্ত অনেক ভেবে চিন্তে বেশ বড়ো দেখে একটা জায়গা পরিষ্কার করে খুব মন দিয়ে সেখানে একটা ছবি এঁকে যতটা পারি আমার কথা, আমার বাবা-মায়ের কথা, বন্ধুদের কথা, স্কুলের কথা, কলকাতা শহরের কথা, শহর ভরা ঘর-বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া, দোকানবাজার, লোকজনের কথা বোঝালাম। কলকাতা নামটাও তাকে বারকতক শুনিয়েছি।

উবা ওই মস্ত বড়ো ছবির ওপর ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুরো ছবিটা দেখেই আবার তার কাঠকুটো সাজাতে লাগল। এই কাঠকুটো দিয়ে ছবি আঁকায় উবা ভারি ওস্তাদ। একপলক চোখ বুলিয়েই তার বলবার কথাটা আমি বুঝে নিলাম।

উবার মুখে কলকাতা কথাটা শুনে আমার এত আনন্দ হলো যে কী বলব! দুই ঠোঁট গোল করে জিভ নেড়ে অদ্ভুতভাবে শব্দটা উচ্চারণ করে আর ছবি দেখিয়ে ও বলল, ‘কলকাতায় জঙ্গল নেই, পাখি নেই, প্রজাপতি নেই, বড়ো বড়ো নদনদী নেই, তুমি সেখানে থাকো কী করে? ও তো শুধু বালির দেশ!’

বালির দেশ অর্থাৎ মরুভূমি। কলকাতায় থাকতে, কই, একথা তো কখনও মনে হয়নি। এখন আমাজনের জঙ্গলে বসে উবার মুখে শুনে মনে হলো, সত্যিই তো, কলকাতায় ঘন সবুজ বনজঙ্গল, পাখি, প্রজাপতি এসব তো দেখা যায় না।

ভ্যানরিকশায়, অনেকটা টিনের বড়ো বাক্সের মতো দেখতে চারদিক বন্ধ গাড়িতে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা গাদাগাদি করে বসে স্কুলে যাচ্ছে — সেই ছবিটা দেখে উবা আমার দিকে তাকাল। এই ছবিটার মানে সে একেবারেই বুঝতে পারেনি। টিনের দেয়ালে ছোটো ছোটো জানালার ফাঁক দিয়ে কেউ কেউ তার কচি মুখ তুলে বাইরেটা দেখতে দেখতে চলেছে, উবা সেই মুখের ওপর, অনেকক্ষণ ঝুঁকে রইল, তারপর মুখ তুলে আমার কাছে এই ছবিটার মানে জানতে চাইল।

আমাজনের জঙ্গলে স্কুল কী করে বোঝাব! আরও কয়েকটি ছবি এঁকে যতটা সম্ভব স্কুলের বিষয়ে বললাম। উবা বেশ খানিকক্ষণ আমার চোখে চোখ রেখে চুপ করে বসে বসে ভাবল। তারপর তার কাঠকুটোর ছবি দিয়ে বলল — জঙ্গলের গাছপালা ফুল ফল কীটপতঙ্গের সঙ্গে না থেকে, গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্ত না দেখে কলকাতায় বসে তুমি কী করে এই জগৎটাকে জানবে?

এর পরেই উবা হঠাৎ আমার একটা হাত নিজের দু-হাতে নিয়ে, আমার দু-চোখে তার সেই গভীর দু-চোখের দৃষ্টি রেখে মুখে কোনো শব্দ উচ্চারণ না করে বলল — তুমি আর ওই দেশে ফিরে যেও না।
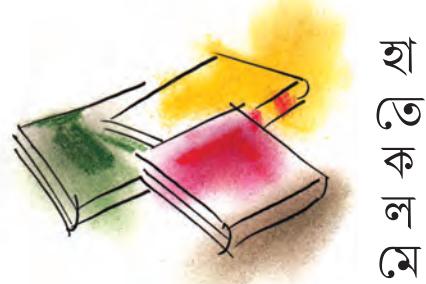
হাতেকলমে

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী (জন্ম ১৯৪১) : কবি, পর্যটক, পত্রিকা সম্পাদক, আলোকচিত্রী, তথ্যচিত্র নির্মাতা ছাড়াও অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর অন্যতম পরিচয় তিনি একজন জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক। পৃথিবীর নানাদেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। নানা ভাষায় অনূদিত তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য — *শাদা ঘোড়া, আমাজনের জঙ্গলে, হীরু ডাকাত, গৌর যাযাবর, টিয়াগ্রামের ফিঙে নদী* ইত্যাদি। তাঁর সম্পাদিত পত্রপত্রিকার মধ্যে রয়েছে — *কালের কষ্টিপাথর, ছেলেবেলা, ভ্রমণ, কর্মক্ষেত্র* ইত্যাদি।

১. অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

২. ভ্রমণ পত্রিকা ছাড়াও তিনি আর কোন পত্রিকার সম্পাদক?

৩. **ঠিক উত্তরের তলায় দাগ দাও।**

৩.১ লেখক গল্পটিতে যে জায়গার উল্লেখ করেছেন সেটি হলো (ইউক্রেন / আমাজন / সুন্দরবন)

৩.২ আমাদের একেবারে (পিছনের / সামনের / পাশের) নৌকা থেকে ভারি সুরেলা বাজনা ভেসে আসছিল।

৩.৩ কোনও একটা নৌকা থেকে বোতোর দেখা পাওয়ার (মিনিট দুয়েকের / মিনিট সাতেকের / মিনিট দশেকের) মধ্যেই সব নৌকায় সেই সুখবর ছড়িয়ে যায়।

৩.৪ (উবা / বোতো / টোবো) আমার চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে চায় আমি কে?

৩.৫ উবা (চকখড়ি /লতাপাতা/ কাঠকুটো) দিয়ে ছবি আঁকায় ভারি ওস্তাদ।

৪. 'গান বাজনা'-শব্দটির প্রথম অংশ 'গান' এবং দ্বিতীয় অংশ 'বাজনা' পরস্পরের পরিপূরক। নীচের শব্দগুলির পরে তাদের সমার্থক বা প্রায় সমার্থক অন্য শব্দ জুড়ে নতুন শব্দজোড় তৈরি করো :

লোক	ভাবনা	আশা	কাঠ
রোগ	ডাক্তার	হাঁক	ধন

৫. **নীচে কিছু কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়া ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কর্তার সাথে কর্ম ও ক্রিয়াকে মিলিয়ে ৫টি বাক্য লেখো :**

কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া
আমি	প্রার্থনা	দেখো
উবা	ছবি	যাচ্ছে
বোতো	পাখি	দেখছে
সে	স্কুলে	করলাম
ছেলেমেয়েরা	আকাশে	আঁকছিল।

৬. **নীচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্যরচনা করো :**

ধীরে ধীরে, বসে বসে, আগে-আগে, হেঁটে-হেঁটে, জেগে-জেগে

শব্দার্থ : ব্যাকুল --- অস্থির। মস্তিষ্ক --- মগজ। কাঠকুটো --- কাঠের ছোটো ছোটো টুকরো। গাদাগাদি — ঘেঁষাঘেঁষি। কচি — নবীন।

৭. **গল্পের ঘটনা অনুযায়ী নীচের বাক্যগুলি পরপর সাজিয়ে লেখো :**

৭.১ বোতোকে দেখা গেছে।

৭.২ বোতোকে দেখার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলাম।

৭.৩ বোতো মনের ভেতরের সুরে তালে ছন্দে নেচে বেড়াচ্ছে।

৭.৪ একটা নৌকার গান বাজনা থেমে গেলে বাকিরা যারা যত আগে খেয়াল করবে তারা তত আগে তাদের নৌকার বাজনা থামাবে।

৭.৫ সামনের নৌকা থেকে সুরেলা বাজনা ভেসে আসছিল।

৮. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৮.১ লেখক কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলেন?

৮.২ লেখক কাকে বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন?

৮.৩ জলের দেবতা বলে কাকে আমাজনের বাসিন্দারা মানে?

৮.৪ উবা কোন শহরকে বালির দেশ বলে বুঝিয়েছিল?

৮.৫ বালির দেশ — কথার অর্থ কী?

জেনে রাখো :

নদী আমাজন। ১৯৪১ সালে পর্যটক ওরেল্লানা এই নদীর নামকরণ করেন। আমাজন শব্দের অর্থ বীর রমণী। পৃথিবীর বৃহত্তম ও দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী আমাজন। ব্রাজিলের উত্তর ও মধ্য অংশ, পার্শ্ববর্তী কলম্বিয়া, বলিভিয়া, ভেনিজুয়েলা, ইকুয়েডর, পেরু প্রভৃতি দেশের অংশ-বিশেষ নিয়ে আমাজন অববাহিকা গড়ে উঠেছে। এত বড়ো নদী অববাহিকা পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। আমাজন অববাহিকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, তাই বনভূমি চিরহরিৎ। এই বনভূমি শুধু গভীরতম অরণ্য নয়, নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর। এই ধরনের বনভূমির নাম সেলভা।

এই দুর্ভেদ্য বনভূমিতে নানাপ্রকার হিংস্র পশু বাস করে। জাগুয়ার, বিশাল আনাকোনডা সাপ, রক্তচোষা বাদুড়, জোঁক, বিষাক্ত মাছি, বিষাক্ত মাংসাশী পিঁপড়ে আর জলে পিরান্‌হা মাছ, কুমির তো আছেই। জল ও স্থল উভয়ই ভয়ংকর।

৯. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

৯.১ কাকাদের সঙ্গো না থাকাকে পাঠ্যাংশের আগন্তুক ছেলেটি সৌভাগ্যজনক মনে করেছে কেন?

৯.২ কোন উৎসবের কথা পাঠ্যাংশে রয়েছে? কীভাবেই বা সে প্রসঙ্গা উত্থাপিত হয়েছে?

৯.৩ 'বোতো' সম্পর্কে আমাজন অঞ্চলে প্রচলিত বিশ্বাসটি কী? তার সম্বন্ধে সকলে কী কল্পনা করে?

৯.৪ গল্প কথকের চোখে দেখা 'বোতো'-র শারীরিক গঠনের পরিচয় দাও। তাকে দেখে আগন্তুক ছেলেটির কেমন লাগল?

৯.৫ যে রাতের ছবি পাঠ্যাংশে রয়েছে, তার বিশেষত্বটি কী, লেখো।

৯.৬ বোতোর কাছে আগন্তুক ছেলেটির নীরব প্রার্থনাটি কী ছিল?

৯.৭ ছবি এঁকে আগন্তুক ছেলেটি 'উবা'-কে কী বোঝাতে চেয়েছিল?

৯.৮ 'উবা'-র কলকাতা সম্বন্ধে কী ধারণা হলো?

৯.৯ কলকাতা সম্পর্কে 'উবা'-র ধারণাকে বদলে দিতে তুমি কী কী করতে চাও, লেখো।

৯.১০ কলকাতার আকর্ষণ ছাড়িয়ে দিতে 'উবা' যে জগতে আগন্তুক ছেলেটিকে আহ্বান জানিয়েছিল তার বর্ণনা দাও।

১০. ঘটনার পাশাপাশি কারণ উল্লেখ করো :

কারণ	ঘটনা
১)	১) সামনের নৌকো থেকে ভারি সুরেলা বাজনা ভেসে আসছিল।
২)	২) উবার ফিশফিশ গলায় শুনতে পেলাম— বোতো! বোতো!
৩)	৩) সকলেই গান বাজনা থামিয়ে যতটা সম্ভব নি:শব্দে চারদিক থেকে গোল হয়ে প্রথম নৌকোটার কাছে ফিরে আসতে থাকে।
৪)	৪) জঙ্গালে ঘুরতে ঘুরতে উবা একেকদিন হঠাৎই হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ে।
৫)	৫) আরও কয়েকটি ছবি এঁকে যতটা সম্ভব স্কুলের বিষয়ে বললাম।

মিলিয়ে পড়ো

পূর্ব পাঠে উষা বলেছে কলকাতা *বালির দেশ*। কিন্তু গ্রাম শহর জঙ্গল নদী এই সবকিছু নিয়েই সভ্যতা বেঁচে থাকে। আমাদের সবার শুভবোধ ও *সত্যি চাওয়া*-র উপরেই তা নির্ভরশীল।

সত্যি চাওয়া

নরেশ গুহ

তোরা সত্যি যদি চাস,
আরও সবুজ হবে ঘাস
আরও মিষ্টি হবে জল
আরও স্বাদের হবে ফল
আরও সত্যি চাইলে পরে
আরও বাতাস গানে ভরে॥

আমি সাগর পাড়ি দেবো

কাজী নজরুল ইসলাম

আমি সাগর পাড়ি দেবো, আমি সওদাগর।
সাত সাগরে ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর।
আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাব সবার ঘাটে,
চলবে আমার বেচাকেনা বিশ্বজোড়া হাটে।
ময়ূরপঙ্খি বজরা আমার 'লাল বাওটা' তুলে
ঢেউ-এর দোলায় মরাল সম চলবে দুলে দুলে।
সিন্ধু আমার বন্ধু হয়ে রতন মানিক তার
আমার তরি বোঝাই করে দেবে উপহার।
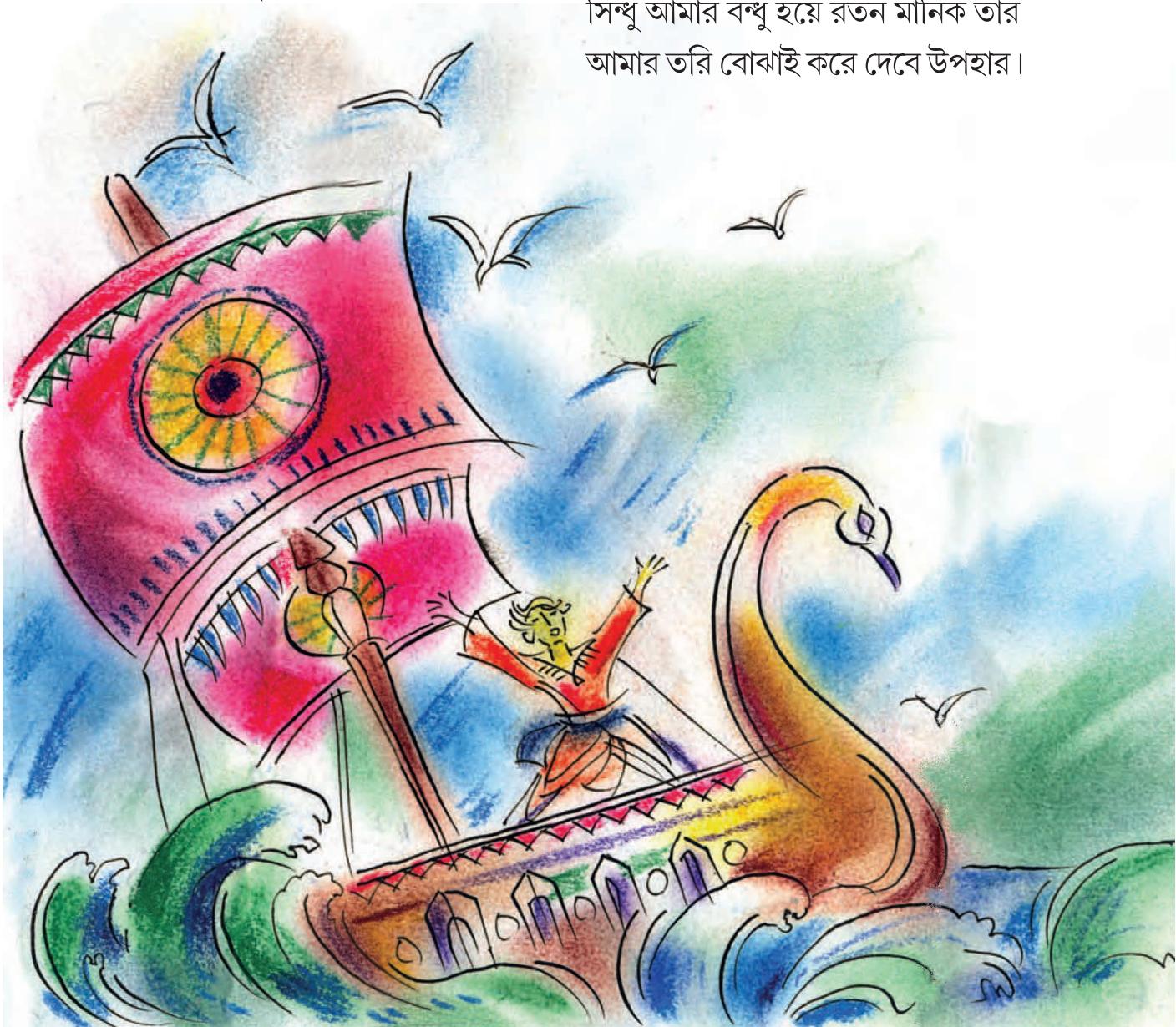
দ্বীপে দ্বীপে আমার আশায় রাখবে পেতে থানা,
শুক্তি দেবে মুক্তামালা আমারে নজরানা।
চারপাশে মোর গাঙচিলেরা করবে এসে ভিড়
হাতছানিতে ডাকবে আমায় নতুন দেশের তীর।
আসবে হাঙর কুমির তিমি — কে করে তায় ভয়;
বলব, 'ওরে, ভয় পায় যে — এ সে ছেলেই নয়।
সপ্ত সাগর রাজ্য আমার, আমি বণিক বীর,
খাজনা জোগায় রাজ্যে আমার হাজার নদীর নীর।
ভয় করি না তোদের দুটো দন্ত নখর দেখে,
জল-দস্যু, তোদের তরে পাহারা গেলাম রেখে
সিন্ধু-গাজি মোল্লামাঝি, নৌ-সেনা ওই জেলে,
বর্শা দিয়ে বিঁধবে তারা, রাজ্যে আমার এলে।'
দেশে দেশে দেয়াল গাঁথা রাখব নাকো আর,
বন্যা এনে ভাঙব বিভেদ করব একাকার।
আমার দেশে থাকলে সুধা তাদের দেশে নেব,
তাদের দেশের সুধা এনে আমার দেশে দেবো
বলব মাকে, 'ভয় কী গো মা, বাণিজ্যেতে যাই!
সেই মণি মা দেব এনে তোর ঘরে যা নাই।
দুঃখিনী তুই, তাইতো মা এ দুখ ঘুচাব আজ,
জগৎ জুড়ে সুখ কুড়াব — ঢাকব মা এ লাজ।'
লাল জহরত পান্নাচুনি মুক্তামালা আনি
আমি হব রাজার কুমার, মা হবে রাজরানি।

হাতে কলমে

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬) : কাজী নজরুল ইসলাম বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য* নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা *মুক্তি* প্রকাশিত হয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে *বিজলী* পত্রিকায় *বিদ্রোহী* কবিতা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কবি তাঁর কবিতায় কেবল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, সমস্ত অন্যায় অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর রচিত বইগুলো হলো — *অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণীমনসা, প্রলয়শিখা*।

১. কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্য জগতে কী অভিধায় অভিহিত?

২. তাঁর লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

৩. **কবিতায় উল্লিখিত 'বিভেদ' শব্দটি দেখো। 'ভেদ' শব্দটির আগে 'বি' বসে তৈরি হয়েছে নতুন শব্দ 'বিভেদ'। নীচে বেশ কিছু শব্দ দেওয়া হলো। নীচের শব্দগুলির আগে 'বি' যোগ করে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করো :**

ভাগ		হার	
তৃষ্ণা		জ্ঞান	
চার		ক্রয়	

শব্দার্থ : পাড়ি — রওনা, যাত্রা। সওদাগর — ব্যবসায়ী। সপ্ত মধুকর — মনসামঙ্গলে বর্ণিত বণিক চাঁদ সওদাগরের সাতটি বাণিজ্য তরির মধ্যে অন্যতম। সওদা — পণ্যদ্রব্য। ময়ূরপঙ্খি — ময়ূরাকৃতি নৌকাবিশেষ। বজরা — বড়ো এবং ধীরগামী নৌকাবিশেষ। মরাল — রাজহাঁস। সিন্ধু — সমুদ্র, সাগর। রতন — রত্ন, দামি পাথর। তরি — নৌকা। থানা — ঘাঁটি, এই কবিতায় 'পাহারা দেওয়া' অর্থে ব্যবহৃত। জহরত — বহুমূল্য পাথর। শুক্তি — ঝিনুক। নজরানা — উপঢৌকন বা ভেট। তায় — তাকে। বণিক — ব্যবসায়ী। খাজনা — কর, রাজস্ব। নীর — জল। দন্ত - নখর — দাঁত - নখ। জলদস্যু — নদী বা সমুদ্রে ডাকাতি করে যারা। তরে — জন্যে। সিন্ধুগাজি — সমুদ্রের পিরসাহেব। বর্শা — একধরনের অস্ত্র। বিভেদ — পার্থক্য, ভেদাভেদ। একাকার — মিলেমিশে যাওয়া। সুধা — অমৃত। দুঃখিনী — যে নারীর দুঃখ ঘোচে না। ঘুচাব — ঘুচিয়ে দেব, দূর করে দেব। কুড়াব — সংগ্রহ করব। লাজ — লজ্জা, শরম।

৪. **নির্দেশ অনুসারে লেখো :**

৪.১ 'তালে তালে' শব্দটিতে একই শব্দ পরপর দুবার বসেছে। তোমাদের কবিতায় দেখত এরকম একই শব্দ পাশাপাশি দুবার বসে কী কী শব্দ তৈরি হয়েছে।

৪.২ 'তালে তালে' শব্দটিতে যেমন একই বর্ণ 'ল' দু-বার বসেছে তেমনি 'ল' ধ্বনিকে দু-বার ব্যবহার করে আরও একটি শব্দ লেখো।

৪.৩ উপরের প্রশ্ন দুটিতে ব্যবহৃত শব্দটির মতো পাঁচটি শব্দ তুমি নিজে তৈরি করো।

৪.৪ 'র' ধ্বনিকে দুবার ব্যবহার করে দেখ তো কোন কোন শব্দ পাও। একটি করে দেওয়া হলো। যেমন — থরথর

৫. **কোন কোন শব্দগুলির অন্ত্যমিল আছে তাদের মেলাও :**

সওদাগর	মাল্লামাঝি
আজ	বন্ধু
বদর-গাজি	লাজ
সিন্ধু	মধুকর

৬. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

৬.১ সওদাগর কোথায় পাড়ি দিতে চায়?

৬.২ ময়ূরপঙ্খি বজরা কিসের মতো দুলে দুলে চলবে?

৬.৩ শুক্তি সওদাগরকে কী নজরানা দেবে?

৬.৪ কথক সওদাগর হয়ে কাদের ভয় পান না?

৬.৫ কথক সওদাগর কীভাবে বিভেদ ভেঙে সমস্তকে একাকার করতে চান?

৬.৬ কথক কাদের জলদস্যু বলেছেন? তাদের জন্য তিনি কাদের পাহারায় রেখে যেতে চান?

৬.৭ 'দেশে দেশে দেয়াল গাঁথা' — বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? কী ভাবে তিনি এর প্রতিকার করবেন?

৬.৮ কবিতায় কথক কোন কোন জিনিসকে 'সাত সংখ্যা' দিয়ে উল্লেখ করেছেন?

৬.৯ দুঃখিনী মায়ের দুঃখ ঘোচাতে কবি কী করতে চান?

৬.১০ কবিতায় কোন কোন রত্নের উল্লেখ আছে খুঁজে বার করো।

৬.১১ কবিতায় কোন কোন জলজ প্রাণীর উল্লেখ আছে?

৭. কবিতায় ‘বেচাকেনা’ শব্দদুটি একসঙ্গে বসলেও শব্দ দুটি বিপরীতার্থক। পাশের শব্দঝুড়ির সাহায্যে এরকম কিছু শব্দের শূন্যস্থান পূরণ করো :

______ বাঁচন ______ পাতাল

দেনা ______ ______ দুঃখ

অগ্র ______ ওঠা ______

______ আঁধার ______ গোড়া

শব্দঝুড়ি
আলো, আকাশ, পাওনা, আগা, সুখ, নামা, মরণ, পশ্চাৎ

৮. মনে করো, তুমি সওদাগর। বিভিন্ন দেশে জিনিসপত্র বেচাকেনা করতে যাও। জিনিসপত্র ছাড়া আর কী কী তুমি বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দেবে? তাদের দেশ থেকে কী কী তোমার সঙ্গে আনবে?

ভাবি আর বলি

১. জল খেলে মরে যায়।

২. নেই মই নেই ডানা, দেয় তবু আকাশে হানা।

৩. কখনও ভুল করে না অথচ সব সময় মার খায়—কে সে?

৪. বসে এক কোণে উড়ে যায় বিশ্বভ্রমণে।

৫. জিনিসটা তোমারই অথচ অন্যে ব্যবহার করে তোমার চাইতে বেশি—কী সেটা?

৬. ভরা পেটে হেলে রয়, খালি পেটে সোজা হয়।

৭. তোমার ডান হাত দিয়ে কোন জিনিস তুমি কখনও ধরতে পারো না।

৮. ছোট্ট দুটি জানালা। তা দিয়ে পুরো পৃথিবী দেখা যায়।

৯. পা ছাড়া আসে যায়, জিভ ছাড়া কথা কয়।

১০. জন্মেও জন্মায়নি, না জন্মেও জন্মেছে—কী সেটা?

১. আগুন। ২. ধোঁয়া। ৩. ঢাক। ৪. ডাকটিকিট। ৫. তোমার নাম। ৬. ধান গাছ।
৭. তোমারই ডান হাত। ৮. দুটি চোখ। ৯. চিঠি। ১০. ডিম
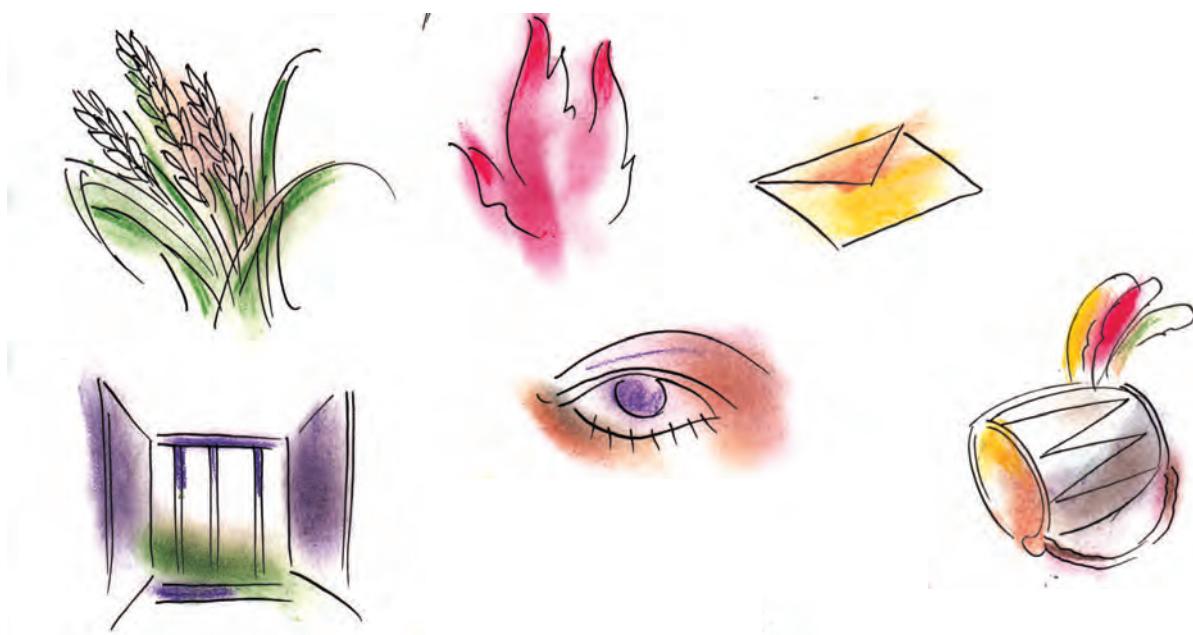
দক্ষিণমেরু অভিযান

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

জ্ঞানের সীমাকে বাড়াবার জন্য, অজানাকে জানবার জন্য মানুষ যে কী অসাধ্যসাধন করছে বা করতে পারে, কাপ্টেন স্কটের আবিষ্কারের কাহিনি থেকে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন ইংল্যান্ডের ডিভনশায়ারের এক গ্রামে স্কট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা অনেকেই সামুদ্রিক বিভাগে বড়ো বড়ো চাকরি করে গিয়েছেন। সমুদ্রের প্রতি একটা টান নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেই জন্য ছেলেবেলা থেকেই তিনি জাহাজে কাজ শিখতে থাকেন এবং কিশোরকালেই জাহাজের কাজে লেগে সমুদ্রযাত্রা করেন।

এই সময়ে জগতের নানা দেশ থেকে দক্ষিণমেরু আবিষ্কারের নানারকমের চেষ্টা চলছিল। কোন জাতির লোক আগে গিয়ে সেখানে পৌঁছোতে পারে সেই নিয়ে একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা সব জাতিরই অন্তরে জমা ছিল।

স্কট যখন কমাণ্ডার হন, সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডে দক্ষিণমেরু অভিযানের জন্য একটা দল গড়া হচ্ছিল। 'রয়েল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি' এই অভিযানটির আয়োজন করেছিলেন। একদিন স্কট লণ্ডনের পথে বেড়াচ্ছেন এমন সময় উক্ত সোসাইটির প্রেসিডেন্ট স্যার ক্লেমেন্টস মার্কহামের সঙ্গে তাঁর দেখা। স্যার মার্কহামের সঙ্গে পরামর্শ করে স্কট এই অভিযানের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেন।

১৯০১ সালের আগস্ট মাসে 'ডিসকভারি' নামক জাহাজে স্কট তাঁর দলবল নিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণমেরুর দিকে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে আর একজন খুব বড়ো নাবিক ছিলেন, তাঁর নাম স্যার আর্নস্ট স্যাকলটন।

দক্ষিণমেরুকে জগতের সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবার জন্যে বিধাতাপুরুষ তার চারিদিকে দুর্লঙ্ঘ্য বরফের প্রাচীর গড়ে রেখেছেন এবং তার ওপারে জাহাজ নিয়ে আর মানুষ যেতে পারে না। মাঝে মাঝে এই বরফের প্রাচীরে ফাঁক দেখা যায়, বরফ যখন গলতে থাকে।

ক্যাপ্টেন স্কট তাঁর দলসুদ্ধ সেই বরফের প্রাচীরের মাঝে এসে উপস্থিত হলেন, কিন্তু বরফের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার কোনো পথ না দেখে তিনি ফিরে আসতে বাধ্য হলেন এবং ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কিং এডওয়ার্ড দ্বীপে নোঙর ফেলে রইলেন। তখন দুরন্ত শীত, সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়ে গেছে। তাঁরা ঠিক করলেন যে আর কিছু দিন পরে শ্লেজে করে যাত্রা করা যাবে।

মাসকয়েক কাটিয়ে ১৯০২ সালের নভেম্বর মাসে শ্লেজযাত্রার সমস্ত আয়োজন হয়ে গেল। ঠিক হলো যে, স্কট, স্যাকলটন ও উইলসন মাত্র এই তিনজনে যাত্রা করবেন এবং সঙ্গে উনিশটা কুকুর নেওয়া হবে।

যাত্রা শুরু হলো সেই নির্দিষ্ট দেশের দিকে। কিছু দূরে যেতে না যেতে নানা প্রকারের বাধা আসতে লাগল। ক্রমশ তাঁরা এগোতে লাগলেন। যেখান দিয়ে যান সেখানে এক এক জায়গায় তাঁবু ফেলে খাবার রেখে যান এবং প্রত্যেক তাঁবুর উপর একটা করে পতাকা গুঁজে রাখেন, কারণ ফেরবার সময় যখন খাবার দরকার হবে তখন এই সমস্ত তাঁবু থেকেই তা পাওয়া যাবে এবং ফেরবার পথেরও নিশানা হবে।

সমস্ত নভেম্বর আর ডিসেম্বর মাস তাঁরা সেই বরফের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন। যতই এগোতে লাগলেন ততই বরফের ঝড় তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল। কুকুরগুলো ক্রমশ অবশ হয়ে আসতে লাগল। এই রকম অবস্থায় আর বেশি দূর এগোনো যায় না দেখে স্কট ফিরলেন। ফিরবার পথে বিপদ আরও ঘনিয়ে এল। স্যাকলটনের হলো অসুখ; খাবারের ডিপোগুলো এত দূরে দূরে পোঁতা হয়েছিল যে এক ডিপো থেকে আর এক ডিপোতে পৌঁছোতে সবাই ক্ষুধায় অবসন্ন ও অজ্ঞান হয়ে পড়তে লাগল। বিশেষ করে কুকুরগুলো, তারাই শ্লেজ টেনে নিয়ে চলেছে। সেই জন্য কুকুরের খাবার জোগাবার জন্যে নিরুপায় হয়ে তাঁরা এক একটা কুকুর মেরে তারই মাংস অপর কুকুরগলোকে খাওয়াতে লাগলেন। এইরকম করে তাঁরা কোনোরকমে জীবন নিয়ে সে যাত্রায় আবার কিং এডওয়ার্ড দ্বীপে ফিরে এলেন।

কয়েক মাস সেই দ্বীপে কাটিয়ে আবার যাত্রা শুরু করলেন। এবার সঙ্গে মাত্র দুজন সঙ্গী ইভানস আর লাসলি। এবার তাঁরা চাকাওয়ালা শ্লেজে যাত্রা করলেন, সঙ্গে কুকুর নিলেন না। কিন্তু অনেক দূরে যাওয়ার পর খাদ্যের সংস্থান ফুরিয়ে আসতে লাগল; এবারেও তাঁরা ফিরতে বাধ্য হলেন।

১৯০৩ সালের শেষাশেষি আবার তাঁরা তাঁদের জাহাজে ফিরে এলেন এবং ঠিক করলেন এবারকার মতো ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু নতুন বিপদ ঘটল। সামনের সমস্ত পথ বরফে বন্ধ হয়ে গেছে। বারো মাইল পর্যন্ত ঘন বরফ পথ আটকে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা নানারকমের যন্ত্র দিয়ে সেই বরফ কেটে পথ তৈরি করতে লাগলেন, কিন্তু কিছু দিন চেষ্টা করে বুঝলেন, এ অসাধ্যসাধন। বরাতক্রমে সেবার খুব শীগগির বরফ গলতে আরম্ভ করল এবং কিছু দিন যেতে না যেতেই স্কট দেখলেন বরফ গলে তাঁদের যাওয়ার পথ তৈরি হয়ে গেছে। তাঁরা এ যাত্রায় যতদূর গিয়েছিলেন তার থেকে আরও ৪৬৩ মাইল দূরে ছিল দক্ষিণমেরু। কিন্তু এর আগে কেউই আর দক্ষিণমেরুর এত কাছে আসতে পারেননি।

স্যার আর্নেস্ট স্যাকলটন ১৯০৮ সালে নিজের দল নিয়ে আবার দক্ষিণমেরুর দিকে রওনা হলেন, কিন্তু তাঁকে ফিরে আসতে হলো। তবে এবার আরও ৯৭ মাইল যেতে পারলেই স্যাকলটনের ভাগ্যেই দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের প্রথম গৌরব লেখা থাকত।

ক্যাপ্টেন স্কট যখন শুনলেন যে স্যার স্যাকল্‌টন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন তখন তিনি আর ঘরে শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। ঠিক করলেন যে, এবার তিনি যে যাত্রা করবেন, তাতে হয় দক্ষিণমেরুতে পৌঁছোবেন, নয় ইংল্যাণ্ডে আর ফিরবেন না। এবার স্কট দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছোলেন বটে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে আর তাঁর ফেরা হলো না।

১৯১০ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে দলবল নিয়ে স্কট 'টেরানোভা' জাহাজে দক্ষিণমেরুর পথে আবার যাত্রা করলেন। ১৯১১ সালের প্রথম দিকে তিনি আবার সেই দুর্লঙ্ঘ্য বরফের প্রাচীরের কাছে উপস্থিত হলেন।

এখান থেকে দক্ষিণমেরু ৩৫০ মাইল দূরে। এই সাড়ে তিনশো মাইল যাওয়া এবং ফিরে আসার আয়োজন করতেই সেপ্টেম্বর মাস এসে গেল। ১৯১২ সালের নববর্ষের প্রথম দিনে আটজন সঙ্গী নিয়ে তিনি দক্ষিণমেরুর ১৭০ মাইলের মধ্যে এসে পড়লেন। সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করে যাত্রার পথে মাত্র চারজন সঙ্গীকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। সঙ্গে যে যে রসদ নেওয়া হলো তা ডিপোতে ডিপোতে জমা রেখে তাঁরা ক্রমশ দক্ষিণমেরুর দিকে এগিয়ে চলতে লাগলেন; এবং পথে কোনো

বিশেষ বিপদের মধ্যে না পড়ে তাঁরা ১৮ জানুয়ারি ১৯১২ সাল, তাঁদের জীবনের ঈপ্সিত দেশ দক্ষিণমেরুতে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ক্যাপ্টেন স্কট সেখানে উপস্থিত হয়েই দেখেন যে, যেখানে তাঁরা তাঁদের দেশের পতাকা প্রথমে পুঁতবেন বলে ভেবেছিলেন সেখানে নরওয়ে দেশের পতাকা উড়ছে, তাঁদের কয়েক সপ্তাহ আগে নরওয়ের বিখ্যাত আবিষ্কারক আমুন্ডসেন দক্ষিণমেরুর প্রথম আবিষ্কর্তার গৌরব অর্জন করে চলে গেছেন। সেই জনমানবহীন অনন্ত তুষারের দেশে নরওয়ের পতাকা, আর কাষ্ঠফলকে আমুন্ডসেনের নাম তাঁর বিজয়বার্তা ঘোষণা করছে।

এবার ফেরবার পালা। যাওয়ার সময় তখন কোনো বিপদ হয়নি, কিন্তু ফেরবার মুখে পথে পথে ভয়াবহ বিপদ এসে বাধা দিতে লাগল। হাওয়া আর বয় না, তার জায়গায় বয় জমাট বরফের কণা। দিনের পর দিন আকাশ পৃথিবী কিছুই দেখা যায় না, শুধু বরফের বৃষ্টি। সেই ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় পাঁচজন লোক চলেছে। পথের দিশা অনন্ত তুষারপাতের মধ্যে হারিয়ে গেছে; অনাহারে সর্বশরীর অবসন্ন। একদিন সেই অবস্থায় ইভানস পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না। শুভ্র তুষার এসে তাঁর মৃতদেহের উপর কবর রচনা করল। তুষারপাত প্রতিদিন বেড়ে চলতে লাগল। অবশেষে তাঁরা একটি ডিপোতে এসে উপস্থিত হলেন। এরপর ক্যাপ্টেন ওটস এক রাত্রে বাইরে গেলেন, কিন্তু আর ফিরলেন না।

সেই ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে অবশিষ্ট দুজন সঙ্গীকে নিয়ে স্কট অগ্রসর হতে লাগলেন। অবশেষে অবসন্ন দেহে নিরুপায় হয়ে তাঁদের সঙ্গে যে তাঁবু ছিল, তাই খাটিয়ে তার ভিতরে ঢুকলেন তাঁরা। তাঁরা তখন ভালোরকমই জানতেন যে, এই তাঁবুই তাঁদের কবর। পাশের সঙ্গীর তখন মৃত্যুশ্বাস উপস্থিত, মৃত্যুর হিমস্পর্শে তখন ক্যাপ্টেন স্কটেরও সর্ব অঙ্গ শিথিল হয়ে আসছে। সেই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বক্ষণে তিনি তাঁর ডায়ারির শেষ পাতা লেখেন— ‘গত এক মাস আমরা যে কষ্ট পেয়েছি, আমি ভাবতে পারি না, কোনো মানুষ কোনো দিন সেরকম কষ্ট সহ্য করেছে কিনা। তবুও আজ ভাগ্যের বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই, যা পেয়েছি তা মাথা পেতে গ্রহণ করেছি। যদি আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম, তাহলে সমস্ত ইংল্যান্ড শুনতে পেত যে, ইংল্যান্ডের গৌরবের জন্য তাঁর কয়েকজন সন্তান কী কষ্টই না সহ্য করেছে— আমাদের এই মৃতদেহ আর আমার এই লেখা হয়তো জগতে একদিন সে কাহিনির সাক্ষ্য দেবে—।’ ক্যাপ্টেন স্কটকে যারা খুঁজতে গিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে তাঁর ডায়ারিও পান।
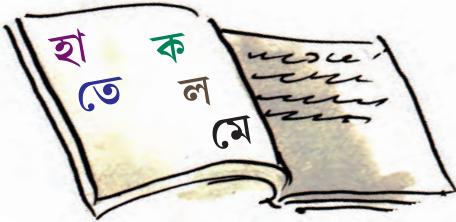
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫—১৯৬৩) : কল্লোল যুগের একজন জনপ্রিয় লেখক। অনুবাদ ও শিশুসাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। গল্প, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ধর্ম প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় নিয়ে তিনি লিখেছেন। তিনি একাধারে গীতিকার, অভিনেতা, কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার ও চিত্র পরিচালক। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই হলো *দুর্গম পথে*, *দুঃখজয়ীর দল*, *বন্ধুর চিঠি*, *না জানলে চলে না* ইত্যাদি। তাঁর অনূদিত কয়েকটি বিখ্যাত বই হলো *মা*, *কুলি* প্রভৃতি। বর্তমান রচনাটি তাঁর *নতুন যুগের মানুষ* বই থেকে নেওয়া ।

১. *দক্ষিণমেরু অভিযান* রচনাংশটি লেখকের কোন বই থেকে নেওয়া?

২. তাঁর লেখা আরো দুটি বইয়ের নাম লেখো।

৩. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৩.১ স্কট ____ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

৩.২ ছেলেবেলা থেকে স্কট ____ কাজ শিখতে থাকেন।

৩.৩ প্রত্যেক তাঁবুর উপর একটা করে ____ গুঁজে রাখা হলো।

৩.৪ ১৯১০ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে দলবল নিয়ে স্কট ____ জাহাজে করে দক্ষিণমেরুর পথে আবার যাত্রা করলেন।

৩.৫ ক্যাপ্টেন স্কট এর মৃতদেহের সঙ্গে তার ____ পাওয়া যায়।

৪. গল্পটিতে যে ইংরাজি মাসের নামগুলি পেয়েছ সেগুলি সাজিয়ে লেখো। সেই সেই মাসের ঘটনাগুলি পাশাপাশি উল্লেখ করো ।

৫. দক্ষিণমেরু অভিযানে ক্যাপ্টেন স্কটের সাহায্যকারী কোন কোন ব্যক্তির নাম পেয়েছ তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

৬. **বাক্যরচনা করো :** স্লেজ, আবিষ্কার, গৌরব, ব্যর্থ, সমুদ্রযাত্রা।

৭. **দক্ষিণমেরু অভিযানে স্কট যে যে বিপদের মুখে পড়েছিলেন তার তালিকা তৈরি করো :**

(একটি উদাহরণ দেওয়া হলো।)

অভিযান	বিপদ
স্কটের দক্ষিণমেরু অভিযান	বরফের ঝড়

শব্দার্থ : আকাঙ্ক্ষা — ইচ্ছা, বাসনা। অন্তর — ভিতর। দুর্লঙ্ঘ্য — যাকে সহজে লঙ্ঘন অর্থাৎ পার করা যায় না। প্রাচীর — পাঁচিল। শ্লেজ — বরফের ওপর কুকুরে টানা গাড়ি। নির্দেশ্য — নির্ধারিত। নিশানা — নির্দশন। বরাতক্রমে — ভাগ্যের জোরে। রসদ — মজুত খাদ্যদ্রব্য। কাষ্ঠফলক — কাঠের ফলক। শ্বাসরুদ্ধ — দমবন্ধ। তুষারপাত — বরফ পড়া। ডিপো — আশ্রয়স্থান। হিমস্পর্শ — বরফের মতো ঠান্ডা স্পর্শ। শিথিল — আলগা।

৮. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৮.১ স্কটের পূর্ব পুরুষেরা কোথায় চাকরি করতেন?

৮.২ ইংল্যান্ডের দক্ষিণমেরু অভিযানের আয়োজক সংস্থার নাম লেখো।

৮.৩ প্রথম দক্ষিণমেরু অভিযান কত সালের কোন মাসে শুরু হয়েছিল?

৮.৪ দক্ষিণমেরু যাত্রায় স্কটের সঙ্গী কারা ছিলেন? মোট কয়টি কুকুর নেওয়া হয়েছিল?

৮.৬ এডওয়ার্ড দ্বীপ থেকে দ্বিতীয়বার যাত্রাকালে কারা স্কটের সঙ্গী হয়েছিলেন?

৮.৭ স্কট আর কত মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারলেই দক্ষিণমেরুতে প্রথম পৌঁছাতে পারতেন?

৮.৮ ১৯০৮ সালে কে দক্ষিণমেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন?

৮.৯ স্যাকলটন আর কত দূর যেতে পারলেই দক্ষিণমেরু পৌঁছোতে পারতেন?

৮.১০ স্কট তৃতীয় অভিযান কত সালে শুরু করেন?

৯. **নীচের প্রশ্নগুলির নিজের ভাষায় উত্তর লেখো :**

৯.১ ছেলেবেলা থেকেই সামুদ্রিক অভিযানে স্কটের আগ্রহ ছিল কেন?

৯.২ স্কট ছাড়া অন্যান্যদের দক্ষিণমেরু আবিষ্কারের অভিযান প্রচেষ্টার কথা লেখো।

৯.৩ অভিযান-আবিষ্কারের কাহিনি আমাদের ভালো লাগে কেন?

৯.৪ দক্ষিণমেরু পৌঁছোনোর পরও ক্যাপ্টেন স্কট কেন খুশি হতে পারেননি? ফেরার পথে তিনি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

১০. টীকা লেখো :

স্লেজ গাড়ি :   কিং এডওয়ার্ড দ্বীপ :

ডিসকভারি :   রয়েল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি :

টেরানোভা :   স্কট :

মিলিয়ে পড়ো

দূরকে জানা যেমন আনন্দদায়ক। ঠিক তেমনই নিজের নিকট চারপাশকেও ভালো করে জানা ও চেনা অত্যন্ত জরুরি। কবিতায় যেন সেই সত্যই ফুটে উঠেছে।

বহু দিন ধরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু॥

পঞ্চম পাঠ

আলো

লীলা মজুমদার

পাত্র-পাত্রী

১. পিসি ২. শম্ভু ৩. নিতাই ৪. গুরুমশাই

এছাড়া বেড়াল, গায়কগণ ইত্যাদি

বারো বছর বয়স হলো, তবু শম্ভুর মন থেকে ভয় যায় না। বনের ধারে শম্ভুর দাদুর ঘর, তার চারদিকটি ভয় দিয়ে ঘেরা। দিনের বেলাতে বনের ভিতর ছায়া ছায়া সড়াৎ সড়াৎ, নিঝুম চুপচাপ। সারারাত বনের মধ্যে কীসের চলাচলের শব্দ খসখস, ফসফস, মটমট ফোঁসফোঁস। পাতার ফাঁক দিয়ে বাতাস বয় শোঁশোঁ। চোখে কিছু দেখা যায় না, সব অন্ধকারের আলকাতরা মেখে অদৃশ্য হয়ে থাকে; তারই মধ্যে মাঝে মাঝে এক এক জোড়া চোখ জ্বলে ওঠে দপ করে, লাল, সবুজ, নীল, তার রং। আর শম্ভু ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। গাছের ডালে কীসের যেন ডানা ঝাপটায় ঝাপুড়ঝুপুড়! শম্ভু দু-কানে আঙুল দিয়ে মাথার ওপরে চাদর টেনে চুপ করে শুয়ে থাকে। দাদুর কথায় ভয় ভাঙে না! পিসির আদরে মন মানে না। দিনের বেলায় গুরুমশায়ের পাঠশালার সবচেয়ে যে দুরন্ত ছেলে, রাতে সে হয়ে যায় ভয়ে কাদা। একদিন ঝোড়ো-সন্ধ্যাবেলায় পিসি ভেবে ভেবে সারা।

পিসি : ও শম্ভু, অন্ধকার হয়ে গেল এই ঝড় উঠল বলে, কিন্তু তোর দাদু তো এখনও ফিরল না। যা বাবা লণ্ঠনটা নিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দ্যাখ।

শম্ভু : ও বাবা। সুয্যি ডুবে গেছে কতক্ষণ! সে আমি পারব না। দাদু এক্ষুনি এসে পড়বে দেখো।

পিসি : কী জানি বাবা, এত রাত তো সে কখনও করে না। একবারটি যা, বাপ।

শম্ভু : আমার—আমার বড়ো ভয় করে।

পিসি : কীসের ভয়, শম্ভু?

শম্ভু : বনের ভয়, অন্ধকারের ভয়।

পিসি : ও কী কথা, শম্ভু? যে বন আমাদের খাওয়ায় পরায়, যেখান থেকে আমার বুড়ো বাবা গাছগাছলা, ওষুধ, আঠা, মধু খুঁজে আনে, সে যে আমাদের মা-বাপ, তাকে ভয় করলে চলবে কেন?

শম্ভু : তোমার ভয় করে না, পিসি, তুমিও যাও না কেন লণ্ঠন নিয়ে; আমি পারব না। অন্ধকারে আমার ভয় করে।

পিসি : (রেগে) আমার পায়ে বাত না থাকলে আমিই যেতাম। দেখি, একটু দোরটা খুলে দেখি।

[ক্যাঁচ করে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের শব্দ ঘরে আসে। দুমদাম করে বাসনকোসন গড়িয়ে পড়ে।]

শম্ভু : (চিৎকার করে) ও কী করছ, পিসি, ঘরের চাল যে উড়িয়ে নেবে। বন্ধ করো, বন্ধ করো শিগগির। (দুম করে দরজা বন্ধ করল)

পিসি : (কাঁদো কাঁদো সুরে) এই জল ঝড়ে বুড়ো দাদু রইল বাইরে, আর তুই উনুনের পাশে আরামে বসে থাকতে পারছিস শম্ভু?

(দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ)

শম্ভু : খুলো না, খুলো না বলছি—পিসি, ও দাদুর ধাক্কা নয়, দাদু আস্তে আস্তে টোকা দেয়।

পিসি : না, আমি নিশ্চয় জানি তার কোনো বিপদ হয়েছে।

[দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের গর্জন ও দু-তিনজন লোকের পায়ের শব্দ।]

নিতাই : আমাকে চিনতে পারছেন না, পিসিমা? আমি পাঠশালার নিতাই। দাদুকে গাছতলায় পড়ে থাকতে দেখে, আমিই গিয়ে গুরুমশাইকে ডেকে আনলাম।

পিসি : ও কী! কে তোমরা? বাবাকে অমন ধরাধরি করে আনছ কেন? বাবার চোখ বন্ধ কেন? ও গুরুমশায়, ভয়ে যে আমার প্রাণ উড়ে যাচ্ছে।

নিতাই : ওঠ শম্ভু, দেখছিস না আমি কেমন জলঝড়ে বেরিয়ে পড়েছি? তোর অত ভয় কীসের?

গুরু : ভয় পাবেন না মা। দাদু গাছ থেকে পড়ে অচেতন হয়েছেন, বোধহয় পায়ের হাড় ভেঙেছে। কোনো ভয় নেই, মা, আমি ওষুধ বলে দিচ্ছি। শম্ভু টোকা মাথায় দিয়ে এক দৌড়ে এনে দিক! দাদু ভালো হয়ে যাবেন। শম্ভু পিসির পিছনে লুকুচ্ছিস যে বড়ো? এদিকে আয়, ওষুধ আনতে হবে।

পিসি : ও ছেলেমানুষ—

গুরু : কীসের ছেলেমানুষ? বারো বছরের বুড়ো ছেলে! আমাদের যা করবার আমরা করেছি। এখন শম্ভু যাক, আপনাদের বাড়ির পিছনেই সুসনি পাহাড়। সুসনি পাহাড়ের মাথায়

হাড়ভাঙা পাতার গাছ, আর পাথরের গুহাতে লাল মধু উপচে পড়ে পাথরের গা বেয়ে গড়াচ্ছে। ওই পাতা বেটে, মধুর সঙ্গে মিশিয়ে লাগিয়ে দিলেই ব্যথা সেরে যাবে। তবে সাবধান দেরি করলে পা ফুলে ঢোল হয়ে যাবে। তখন ওষুধের গুণ ধরবে না। দু-ঘণ্টার মধ্যে ওষুধ লাগাতে হবে। আচ্ছা আমরা চললাম। শম্ভু বেরিয়ে পড়। জলঝড় কমে এসেছে। এই বেলা পথ ধর।

[দরজা খুলে প্রস্থানের শব্দ। দরজা বন্ধ।]

পিসি : ও কী রে শম্ভু মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লি যে বড়ো? শুনলি না দু-ঘণ্টার মধ্যে ওষুধ না লাগালে ওষুধের গুণ ধরবে না?

শম্ভু : না ধরে না ধরুক। কাল ভোরে উঠে এনে দেব, এখন আমি বেরোতে পারব না।

বুড়ো দাদু অসাড় অচেতন হয়ে পড়ে থাকে, পিসিও তার পাশে মুখ গুঁজে বসে থাকে, কেউ কথা কয় না। উনুনের উপরে ভাতের হাঁড়ি টগবগ করে ফুটতে থাকে কিন্তু দাদুর মুখে কথা নেই, ছাই-এর মতো সাদামুখ। উশখুশ করতে থাকে শম্ভু, আহা দাদু যদি না বাঁচে! তবু ঘরখানি যেন দু-হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে রাখতে চায়। উনুনের পাশের গরম জায়গাটি থেকে মেনি বেড়াল মিটমিট করে চায়।

বেড়ালের গান

মিয়াও! কোথা যাও?
যেও না কো!
এই ঘরেতে আরাম বড়ো,
সুখে থাকো!
কে বলে গো বাইরে যেতে?
আরামেতে গরমেতে
নিরাপদে বিছানা পেতে,
শুয়ে থাকো!
যেও নাকো!
ঝড়ে পড়ে জলে ভিজে
কেন মিছে মরবে নিজে
যেও না কো!

পিসি : শম্ভুরে, যখন এতটুকুটি ছিলি, বাপ-মা তোর বিদেশে গেল, দাদুই তোকে বুকে করে মানুষ করল, সেসব কথা কি ভুলে গেছিস? যে আমাদের প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল, মাথার উপরকার এই ঘরের ছাদ নিজের হাতে বেঁধেছিল, হাঁড়ির ভিতরকার ওই চাল নিজে গিয়ে হাট থেকে কিনে এনেছিল, কত কষ্টের টাকা দিয়ে, তাকে আমরা বাঁচাতে পারলাম না।

আর বসে থাকতে পারে না শম্ভু, দেয়াল থেকে টোকা পাড়ে, তাক থেকে লণ্ঠন জ্বালে, মধুর শিশি নেয়। পিছন ফিরে চায় না, পিসিকে কিছু না বলে দরজা ঠেলে জল ঝড়ে বেরিয়ে পড়ে।

[দরজা দুম করে বন্ধ হওয়ার শব্দ,—সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়ের অট্টরোল। কে যেন গর্জন করে ডাকে—শম্ভু—শম্ভু—শম্ভুউ—উ—]

শম্ভু : (ভয়ে মুখ ঢেকে) — কে—কে—তোমরা? অন্ধকারে ডানা মেলে আমাকে ধরতে আসছ? আমি—আমি কোথায় পালাব? ও কে? ও কে?

প্যাঁচাদের গান

হুতুমরা : হুতুম থুম হুতুম থুম
কে যায় রেতে?
চোখে নেই ঘুম?
বাঁকা ঠোঁট, ভাঁটা চোখ,
জোরালো পাখা, ধারালো নোখ।

লক্ষ্মীপ্যাঁচারা : আমরা প্যাঁচা, প্যাঁচা, প্যাঁচা,
এবার প্রাণের ভয়ে চ্যাঁচা!
পাসনি ভয়—
তাই কি হয়?

হুতুমরা : হুতুম থুম হুতুম থুম।

শম্ভু : না, না, কোথায় তোমরা? কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না কেন? কোথায় তোমরা? (লণ্ঠনটা তুলে) দেখি তোমাদের মুখ।

শম্ভু যেই না তুলে ধরেছে লণ্ঠন, অমনি প্যাঁচাদের চোখে আলো পড়েছে, আর চোখ গেছে ধাঁধিয়ে। প্যাঁচারা তখন ডানা দিয়ে মুখ ঝেঁপে পালাবার পথ পায় না।

শম্ভু : আঃ, বাঁচা গেল, সব পালিয়েছে। কিন্তু—কিন্তু গাছগুলো অমন কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছে কেন, দিনের বেলায় তো ওরকম থাকে না। আর আর ওই যে তালগোল পাকিয়ে ডালের উপরে, ওটা কী? ও বাবা!—কেন যে এলাম মরতে এই রাতে।

গাছেদের গান

যা ফিরে যা! হাত ধরাধরি
পথ বন্ধ করি।
ঝুরি নামিয়ে।
দিই থামিয়ে।
দেখ প্রকাণ্ড, আমাদের কাণ্ড
পথ জুড়ে রয়,
নেই তোর ভয়?

শম্ভু : না, না, না, অমন করে আমাকে ঘিরে ফেলো না। কী করি এখন? কোন দিকে পালাই? দেখি, দেখি, পালাবার পথ কই।

চারিদিকে আলো ফেলে। শম্ভু দেখে গাছের ডালে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ও তো মোটেই অজগর নয়, ঝুরিগুলো ওই রকম তালগোল হয়ে আছে। আর গাছের তলা দিয়ে ওই যে এঁকেবেঁকে চলেগেছে সুসনি পাহাড়ে যাওয়ার পথটি।

শম্ভু : উফ! বাঁচা গেল। গাছপালা পাতলা হয়ে এসেছে। বাবা! বনজঙ্গলে আমার বড়ো ভয় করে। কিন্তু ওগুলো কী, ছায়ার মতো এ-ঝোপের পিছন থেকে ও-ঝোপের পিছনে চলে যাচ্ছে। ও বাবা! কী ওগুলো? বাঘ নাকি?

বনবেড়ালদের গান

১ম : বন ভোজন হবে, আহা,
সকলে : বাহবা বাহবা বাহা! বন ভোজন হবে!
২য় : কবে?

১ম : শিকার ধরলে তবে।
২য় : শিকার ধরগে তবে।
সকলে : আহা!
বাহবা বাহবা বাহা!

তখন উঠে পড়ে শম্ভু, ভয়ে তার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়, চোখ বুজে ইদিক উদিক ছোটে। হাত থেকে টোকা পড়ে যায়, লণ্ঠন পড়ে যায়, মধুর শিশি মাটিতে গড়াগড়ি খায়। মনসাগাছে ঝোপে-ঝোপে ঠোকর খায়। ঝোপরা তাকে টিটকিরি দেয়।

মনসাঝোপের গান

কাঁটা ভরা গায়ে
ব্যথা দেব পায়ে!
দ্যাখ না ঝোপের মাঝে
বাঁকারা লুকিয়ে আছে,
তাদের নাম করতে নেই,
যারা রক্ত শোষে সেই!
ঝোপে ঝাড়ে গাছে
তাদের চক্ষু জেগে আছে।
এ পথে কেউ যায়?

হোঁচট খেয়ে আবার পড়ে যায় শম্ভু, হাতের তলায় মধুর শিশি খুঁজে পায়। ভয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আবার টোকা তুলে নেয়, লণ্ঠনটাকে উঁচু করে ধরে। অমনি চারদিকে সরসর, পালাপালা, বনবেড়ালের দল চোখ ছোটো করে, মনসাঝোপের আড়াল দিয়ে আস্তানায় ফিরে যায়।

শম্ভু : আরে এই তো পৌঁছে গেছি, এই যে গোছা গোছা হাড়ভাঙা পাতার গাছ। আর ওই তো মধুর গুহা। এবার শিশিটা ভরে নিলেই হলো। কিন্তু — কিন্তু গুহার ভিতরটা অমন অন্ধকার কেন? কীসের সোঁদা গন্ধ নাকে আসছে? এতদূর এসেও শেষটা কী খালি হাতেই ফিরতে হবে? ইস! কী অন্ধকার!

বাদুড়দের গান

ডানা মেলা কালো ভয়,
তারই হোক জয়!
আঁধারে জ্বলিছে দাঁতের সারি,
করাল কঠিন ধারালো ভারি,
তারই হোক জয়।
আলো না সয়,
গুহাতে রয়,
তারই হোক জয়।
সোঁদা গন্ধ, বন্ধ গুহা
সেখানে ভয়!
তারই হোক জয়!

শম্ভু : (স্বর বদলে)—না! আলো যে সইতে পারে না তাকে আমি ভয় করব না। এই আলো তুলে ধরলাম। কে আছ ভিতরে, বেরিয়ে এসো। আমি মধু নেব, আমি তোমাদের ভয় পাই না! আমার দাদুকে আমি ভালো করে তুলব, কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

অমনি সরসর ফড়ফড় ঝটফট করে, আলোয় অন্ধ রাশি রাশি বাদুড় ডানা মেলে গুহা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। লণ্ঠনের আলোতে শম্ভু দেখলে ফাঁকা গুহা, তার দেয়ালের গায়ে টুপ টুপ করছে মৌচাক, পাথর বেয়ে মধু গড়াচ্ছে। শিশি ভরে বাইরে বেরিয়ে দু-মুঠো হাড়ভাঙা পাতা তুলেই এসে দেখে শম্ভু, কখন মেঘ কেটে গেছে, দূরে দূরে খানকতক মনসাঝোপ! আর পায়ের কাছেই গাছের তলা দিয়ে ঘরে ফেরার পথ। মুখ তুলে বুক ফুলিয়ে দৌড়ে শম্ভু সেই পথ ধরল। চারদিক যেন গান গেয়ে উঠল, ভয়-দূর-করা আলোর গান, সাহসের গান।

যবনিকা পতন

হাতে কলমে

লীলা মজুমদার (১৯০৮—২০০৭) : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধরীর ভ্রাতা এবং প্রখ্যাত লেখক প্রমদারঞ্জন রায়ের কন্যা। লেখিকা ছোটোদের জন্য প্রথম যে বইটি লেখেন তার নাম *বদ্যিনাথের বড়ি*। তাঁর লেখা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই — *হলদে পাখির পালক*, *চিনে লণ্ঠন*, *পাকদণ্ডী*, *পদিপিসির বর্মিবাক্স*, *মাকু* ইত্যাদি। লেখিকার অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক — *বকবধ পালা*, *লঙ্কাদহনপালা*। যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে বহুদিন *সন্দেশ* পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেছেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি *রবীন্দ্র পুরস্কার* এবং *আনন্দ পুরস্কার* পেয়েছিলেন। তাঁর রচিত সাহিত্যসম্ভার শুধুমাত্র বাংলায় নয়, বিশ্বের দরবারে সমাদৃত।

১. লীলা মজুমদারের সম্পাদিত পত্রিকাটির নাম কী?

২. তাঁর লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৩.১ নিতাই কে?

৩.২ সারারাত বনের মধ্যে কেমন শব্দ হয়?

৩.৩ শম্ভুর দাদু বন থেকে কী কী খুঁজে আনে?

৩.৪ কারা শম্ভুকে ভয় দেখিয়েছিল?

৩.৫ শম্ভুর দাদুর জন্য কী আনতে গিয়েছিল?

৩.৬ দাদুর পায়ের ব্যথা কোন ওষুধে সারবে?

৩.৭ শম্ভু শেষপর্যন্ত মন থেকে কী দূর করতে পেরেছিল?

৩.৮ এই নাটকে মোট কয়টি চরিত্রের দেখা মেলে?

৪. **ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৪.১ শম্ভুর ______ (বারো / তেরো/ চোদ্দো) বছর বয়স।

৪.২ ______ (পাহাড়ের / বনের / মাঠের) ধারে শম্ভুর দাদুর ঘর।

৪.৩ দিনের বেলায় পাঠশালার সবচেয়ে দুরন্ত ছেলে ______ (নিতাই / গুরু / শম্ভু)।

৪.৪ হাড়ভাঙা পাতার গাছ ______ (সুসনি/ শুশুনিয়া) পাহাড়ের মাথায়।

৪.৫ শম্ভুকে বাইরে যেতে বারণ করেছিল ______ (কাক / গোরু/ বেড়াল)।

৫. ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও :

ক	খ
পাঠশালা	কাঁটা
বন	ভাত
হাঁড়ি	ভয়
অন্ধকার	গুরুমশায়
মনসাঝোপ	গাছপালা

৬. **পাশের শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করো :**

৬.১ পাতার ফাঁক দিয়ে বাতাস বয় ______।

৬.২ বুড়ো দাদু ______ অচেতন হয়ে পড়ে থাকে।

৬.৩ হাতের তলায় ______ শিশি খুঁজে পায়।

৬.৪ দূরে দূরে খানকতক ______।

৬.৫ করাল কঠিন ______ ভারি।

শব্দঝুড়ি
ধারালো, অসাড়, মধুর, শোঁ শোঁ, মনসাঝোপ।

শব্দার্থ : প'ল — পড়ল। ধ'ল — ধরল। অচেতন — অজ্ঞান। উশখুশ — অস্থিরতার ভাব। হাট — গ্রামের বাজার, যা প্রতিদিনের পরিবর্তে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে বসে। টোকা --- তালপাতা দিয়ে তৈরি বড়ো টুপি। লণ্ঠন — কাচ দিয়ে ঘেরা বাতিবিশেষ। হোঁচট — ঠোক্কর, ধাক্কা। আস্তানা — বাসস্থান। সোঁদা গন্ধ — ভিজে মাটির গন্ধ।

৭. **একই অর্থের শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো :** বায়ু, শিক্ষক, বিদ্যালয়, অজানা, শিলা, আঁখি।

৮. **বিপরীতার্থক শব্দ লিখে তা দিয়ে বাক্যরচনা করো :** গরম, দুঃখ, দুরন্ত, ভয়, বন্ধ।

৯. **নীচের বর্ণগুলি কোনটি কী তা পাশে ‘✓’ চিহ্ন দিয়ে বোঝাও :**

বর্ণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অঘোষ	সঘোষ
ক				
ছ				
থ				
দ				
ব				
ঘ				
ট				
ন				

১০. পাঠ থেকে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি খুঁজে নিয়ে তার একটি তালিকা তৈরি করো : (যেমন—খসখস)

১১. বাক্য বাড়াও :

১১.১ আমি নেব। (কী নেব?)

১১.২ দাদু অচেতন হয়েছেন । (কীভাবে?)

১১.৩ চাল নিজে গিয়ে কিনে এনেছিল। (কোথা থেকে?)

১১.৪ নাকে গন্ধ আসছে। (কেমন গন্ধ?)

১১.৫ বনবেড়ালের দল মনসাঝোপের আড়াল দিয়ে ফিরে যায়। (কোথায়?)

১২. নীচের বাক্যগুলির মধ্যে থেকে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়াপদগুলি খুঁজে বার করো :

১২.১ আমি ওষুধ বলে দিচ্ছি।

১২.২ বাঁকারা লুকিয়ে আছে।

১২.৩ সূয্যি ডুবে গেছে কতক্ষণ!

১২.৪ ঝোপরা তাকে টিটকিরি দেয়।

১২.৫ দাদুকে আমি ভালো করে তুলব।

কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া

১৩. নীচের দুটি ছবির মধ্যে ছয়টি অমিল খুঁজে বের করো :
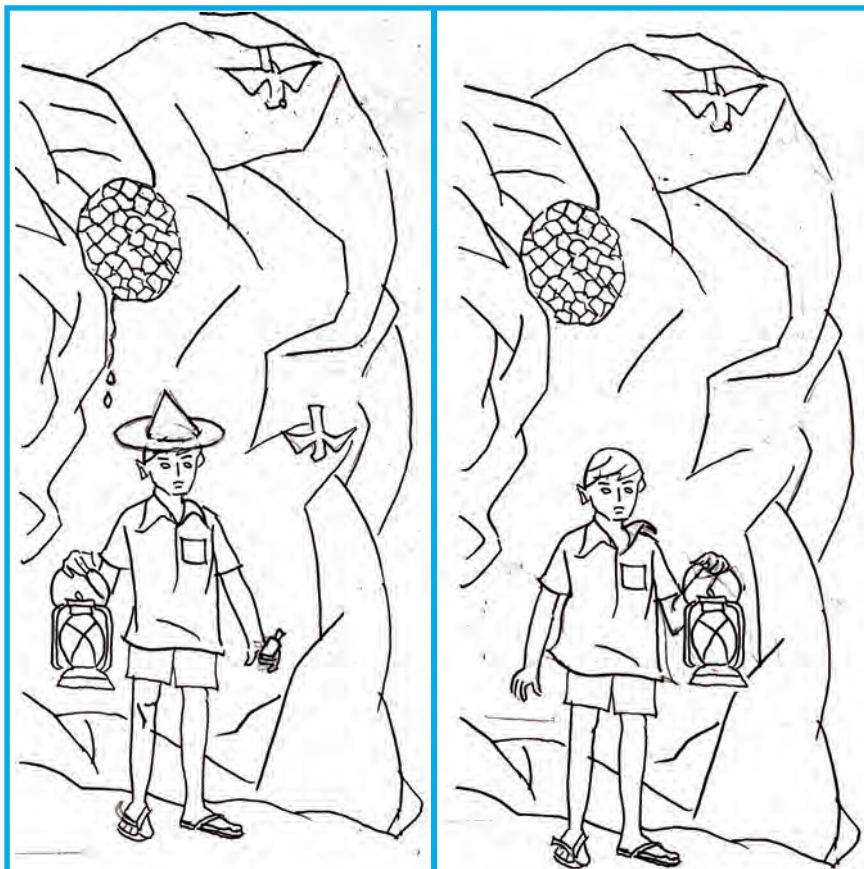
বর্ষার প্রার্থনা

জসীমউদ্দীন

জসীমউদ্দীন (১৯০৪-১৯৭৬) : বিখ্যাত কবি, গীতিকার, লোকসংস্কৃতি গবেষক। 'পল্লীকবি' নামেই তিনি সমধিক খ্যাত। তাঁর লেখা গীতিগ্রন্থগুলির মধ্যে 'রঙ্গিলানায়ের মাঝি' 'গাঙের পার', 'মুর্শিদা গান', 'পদ্মাপার', 'রাখালি গান' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বেলা দ্বিপ্রহর ধু ধু বালুচর
ধূপেতে কলিজা ফাটে পিয়াসে কাতর
আল্লা মেঘ দে পানি দে ছায়া দেরে তুই॥

আসমান হইল টুডা টুডা জমিন হৈল ফাডা
মেঘরাজা ঘুমাইয়া রইছে মেঘ দিব তোর কেডা॥
আলের গোরু বাইন্দ্যা গিরস্থ মরে কাইন্দা
ঘরের রমণী কান্দে ডাইল খিচুড়ি রাইন্দা॥
আমপাতা নড়ে চড়ে কাডল পাতা ঝরে
পানি পানি কইরা বিলে পানি-কাউরী মরে॥
ফাইট্যা ফাইট্যা রইছে যত খালা-বিলা-নদী
জলের লাইগা কাইন্দা মরে পংখী জলধি॥
কপোত-কপোতী কান্দে খোপেতে বসিয়া
শুকনা ফুলের কড়ি পড়ে ঝরিয়া ঝরিয়া॥

ষষ্ঠ পাঠ

অ্যাডভেঞ্চার : বর্ষায়

মণীন্দ্র গুপ্ত

গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এসেছি। খবর পেয়ে ছোটোপিসিমা আর সেজোপিসিমার চার ছেলেমেয়ে তাদের দুই দূর গ্রামের বাড়ি থেকে একসঙ্গে এসে হাজির। আমরা সবাই দু-এক বছরের ছোটো বড়ো। সেজোপিসিমার মেয়ে একটি পাক্কা টমবয়—সে গাছকোমর বেঁধে আমাদের আগে আগে গাছে উঠে যায়, মারামারি বাঁধলে দঙ্গালে লড়ে। তার নাকে নোলক, কিন্তু মাথাটি ন্যাড়া।

এক বাড়ির মজা যথেষ্ট না, সুতরাং ঠিক হলো আমাদের দলটা এবার ছোটোপিসিমার বাড়ি হয়ে সেজোপিসিমার বাড়ি যাবে।

সকালবেলা ফেনসা ভাত খেয়ে আমরা চার ভাই এক বোন বেরোলাম। আমাদের মধ্যেকার আনন্দ দিগন্ত পর্যন্ত বাতাসের সঙ্গে হু হু করে ছুটে চলেছে, শূন্যে রামধনুর মতো আমাদের ফুর্তি ঠিকরোচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকের শরীর লঘু, পাখির মতো শিস দিতে পারি, চাইলে উড়তেও বোধহয় পারি।

আমরা যতরকম সম্ভব মজা করতে করতে পথ চলতে লাগলাম। মাটির উঁচু পথের দু-পাশে নানা উচ্চতার পাটক্ষেত। গ্রীষ্মের রোদ কড়া হতে পারছে না—পাটক্ষেতের নীল হাওয়া এসে তাপ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পড়ন্তবেলায় আমরা অশ্বিনীকুমার দত্তের গ্রাম বাটাজোড় ছাড়ালাম, সন্ধ্যার আগেই পৌঁছোলাম ছোটোপিসিমার বাড়ি।

ছোটোপিসিমা বিধবা হয়ে তখন একা একা ভিটে আগলান, ছেলেদের আগলান। কিন্তু তাঁর প্রাণশক্তি প্রচুর—দিনে খলবল করে কাজ করেন, রাতে লণ্ঠন জ্বালিয়ে পাহারা দেন। চোর, ডাকাত, প্রতিবেশী এবং সন্তানেরা কেউ তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না।

ছোটোপিসিমার কাছে দু-দিন নানারকম খেয়ে, তিন দিনের দিন আমাদের দলটা চলল সেজোপিসিমার বাড়ির দিকে। তাঁদের গ্রামের নাম চন্দ্রহার।

বেশ হই হই করে পথ চলছিলাম। অপরাহ্নে হঠাৎ মেঘ উঠল যেন নীল ঘাস দিয়ে বোনা পাখির বাসা। বাতাস আর বিদ্যুৎ তার মধ্যে এসে ঘোঁট পাকাতে লাগল। তারপর পুটপাট করে বৃষ্টি নামল। আমাদের পাঁচজনের তাপ্পিমারা একটামাত্র ছাতা, সেটাও হাওয়ার দমকে উলটে গেল। বৃষ্টি ঝেঁপে এলে পথের পাশে গাছতলায় দাঁড়াই, কমে গেলে আবার হাঁটি—এইভাবে থেমে থেমে চলতে চলতে শেষে বিরক্ত হয়ে বেপরোয়া বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে লাগলাম। মাঠে মাঠে জল দাঁড়িয়ে গেছে। ছোটো ছোটো স্রোত এসে পড়ছে খালে, দূরে দেখা যায় পাটক্ষেতের উপর বৃষ্টি ঘুরপাক খাচ্ছে, জলের ছায়া কত দূর পর্যন্ত আমাদের ঘিরে আছে।

সন্ধ্যার মুখে পিসিমাদের বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখি মাঠের জল একটা টুবটুবু ভরা পুকুরের সঙ্গে এক হয়ে গেছে, আর সেই গোড়ালিডোবা ছিপছিপে জলের পথ ধরে পুকুরের আধ হাত লম্বা পুরোনো কই মাছেরা সার বেঁধে মাঠ পেরিয়ে চলেছে দেশান্তরে। আমরা কালক্ষেপ না করে দেড়-দুই কুড়ি কই সেই উলটানো ছাতার মধ্যে ভরে ফেললাম।

সেজোপিসিমার বাড়ি দু-দিন কাটল, তিন দিন কাটল, কিন্তু সেই নাগাড়ে বৃষ্টি আর থামে না। এই জলের মধ্যে পিসি ছাড়বে না, এদিকে আমার মন ছটফট করছে নিজের বাড়ির জন্য। এক পিসতুতো ভাই একটা তুক বলল, একশোটা পুর কাগজে লিখে পোড়ালে নাকি বৃষ্টি থেমে যায়। আমি কাশীপুর, চাঁদপুর, ফতেপুর, বদরপুর, শিবপুর, অনুরাধাপুর—পৃথিবীর যত পুর আছে লিখে পোড়ালাম। কিন্তু কিছু হলো না। আমি থেকে থেকে আকাশ দেখি: অশেষ মেঘ। মন ব্যাকুল হয়ে উঠছে। শেষে দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বৃষ্টি যেই একটু ধরেছে আমি সবচেয়ে ছোটো ভাইটাকে বলে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

পথঘাট জলে ভেজা, বাতাসে জলকণা। এক্ষুনি আবার বৃষ্টি আসবে। আমি হনহন করে পা চালালাম। পথ একেবারে জনহীন, একটা গোরু-বাছুর পর্যন্ত নেই। দিগন্ত পর্যন্ত দু-দিকে শুধু পাটক্ষেত। মাইল

দুয়েক যেতে না যেতে বৃষ্টি এল, আমি না থেমে চলতে লাগলাম, এখনও অন্তত দশ ক্রোশ অচেনা পথ পাড়ি দিতে হবে।

মাঠের বৃষ্টি বড়ো বিশাল। অনাবৃত পৃথিবীকে নিরাশ্রয় পেয়ে তার বল দুর্ধর্ষ। বাতাসের বেগ জলের রেখাকে থুড়ে থুড়ে ধোঁয়া করে দিচ্ছে। পিঠের উপরে বৃষ্টি আমাকে তার পেরেকগাঁথা থ্যাবড়া হাতে চড়ের পর চড় মারছে। কিন্তু ভালোই হলো—ঝড়ের ধাক্কা আমাকে তিনগুণ বেগে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল সামনে— শরীরটাকে শুধু খাড়া রাখতে পারলেই হলো, পা বিনা আয়াসে অতি দ্রুত মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়।

কিন্তু সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে বৃষ্টি নেমেছে নাকি! বাতাসের গর্জনের সঙ্গে চারিদিকে বাজ ডাকছে কড় কড় কড় কড়—আমি ছাড়া এই বাংলা দেশের মাঠে কেউ নেই।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি আর হাওয়ার দমকে আমার শরীরে এবার ঠান্ডার কাঁপুনি ধরল। আমি প্রায় দৌড়োতে লাগলাম। এমন সময় দেখি সামনে চাঁদসির লোহার পুল। আষাঢ়ান্ত বেলার তখনও খানিকটা বাকি আছে। বৃষ্টিও একটু ধরে এল। বৃষ্টি থেমে যাওয়া হাওয়ায় আমি ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটতে লাগলাম। বাড়িতে যখন পৌঁছোলাম তখন মেঘলোকে রক্তহীন শেষ সূর্যাস্তলেখা।

বড়োমা ছোটোমা আমাকে ওই ঝড়জলের মধ্যে দেখে অবাক। তাড়াতাড়ি গা-মাথা মুছে, শুকনো কাপড় পরে, পুরু কাঁথার মধ্যে সেঁধিয়ে গেলাম শরীর গরম করতে।

হাতেকলমে

মণীন্দ্র গুপ্ত (১৯৩০ —) : বাংলা কবিতা ও গদ্য রচনায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। গদ্য-পদ্য মিলিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় তিরিশ। দীর্ঘকাল *পরমা* নামে একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— *অক্ষয় মালবেরি*, *চাঁদের ওপিঠে*। ২০১১ সালে তিনি *সাহিত্য অকাদেমি* পুরস্কারে সম্মানিত হন।

১. মণীন্দ্র গুপ্ত কোন পত্রিকা সম্পাদনা করতেন?

২. তাঁর লেখা একটি বইয়ের নাম লেখো।

৩. **অনধিক দুটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

৩.১ এই গল্পের কথক কী সূত্রে বাড়ি এসেছিল?

৩.২ খবর পেয়ে কারা কারা এল?

৩.৩ 'টমবয়' শব্দের অর্থ কী?

৩.৪ কার নাকে নোলক ছিল?

৩.৫ ভাই-বোনেরা মিলে কী ঠিক করল?

৩.৬ 'ফেনসা ভাত' কী?

৩.৭ অশ্বিনীকুমার দত্ত কে ছিলেন?

৩.৮ কথক এবং তার ভাই-বোনেরা সন্ধ্যার আগেই কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল?

৩.৯ পাঁচ ভাই-বোনের কাছে ছাতা কটা ছিল?

৩.১০ বাড়ি ফিরে কথক কী করেছিল?

৪. **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :** দেশান্তর, আষাঢ়ান্ত, সূর্যাস্ত, অপরাহ্ণ, ব্যাকুল।

৫. **নীচের শব্দগুলি বিভিন্ন স্বাধীন বাক্যে ব্যবহার করো :** হই হই, পুটপাট, টুবুটুবু, ছিপছিপে, ছটফট, কড়কড়।

৬. **লিঙ্গান্তর করো :** সেজোপিসিমা, ন্যাড়া, ভাই, প্রতিবেশী।

৭. **নীচের বাক্যগুলির নিম্নরেখাঙ্কিত অংশে কোন বচনের ব্যবহার হয়েছে চিহ্নিত করো :**

৭.১ সকালবেলা ফেনসা ভাত খেয়ে আমরা চার ভাই এক বোন বেরুলাম।

৭.২ ছোটো ছোটো স্রোত এসে পড়ছে খালে।

৭.৩ সেজোপিসিমার মেয়ে একটি পাক্কা টমবয়।

৭.৪ পুকুরের আধ হাত লম্বা পুরোনো কই মাছেরা সার বেঁধে মাঠ পেরিয়ে চলেছে দেশান্তরে।

৭.৫ আমরা কালক্ষেপ না করে দেড়-দুই কুড়ি কই সেই উলটানো ছাতার মধ্যে ভরে ফেললাম।

শব্দার্থ : গাছকোমর --- কোমরে কাপড় শক্ত করে পেঁচিয়ে বা জড়িয়ে নেওয়া। দঙ্গল --- দল। ফেনসা ভাত — ফেন সমেত ভাত। ঘোঁট — গোলমাল। অনাবৃত — আবরণহীন। দুর্ধর্ষ — যাকে পরাজিত করা কষ্টকর। আয়াসে — পরিশ্রমে। আষাঢ়ান্ত — আষাঢ় মাসের শেষ। সেঁধিয়ে — প্রবেশ করে।

৮. নীচের বাক্যগুলিতে কোন পুরুষের ব্যবহার হয়েছে লেখো :

৮.১ আমরা সবাই দু-এক বছরের ছোটো বড়ো।

৮.২ সে গাছকোমর বেঁধে আমাদের আগে আগে গাছে উঠে যায়।

৮.৩ পুরু কাঁথার মধ্যে সেঁধিয়ে গেলাম শরীর গরম করতে।

৮.৪ বড়োমা ছোটোমা আমাকে ওই ঝড়জলের মধ্যে দেখে অবাক।

৮.৫ চোর, ডাকাত, প্রতিবেশী এবং সন্তানেরা কেউ তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না।

৯. নীচের রেখাঙ্কিত শব্দগুলির অর্থ এক রেখে অন্য শব্দ বসাও :

৯.১ মারামারি বাঁধলে দঙ্গলে লড়ে।

৯.২ শেষে বিরক্ত হয়ে বেপরোয়া বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে লাগলাম।

৯.৩ পা বিনা আয়াসে অতি দ্রুত মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়।

৯.৪ এক পিসতুতো ভাই একটা তুক বলল।

৯.৫ বৃষ্টিও একটু ধরে এল।

১০. শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো :

১০.১ পা বিনা আয়াসে অতি দ্রুত মাটি ______ চলে যায়।

১০.২ আমি ঠকঠক করে ______ হাঁটতে লাগলাম।

১০.৩ ______ জল দাঁড়িয়ে গেছে।

১০.৪ মাইলদুয়েক ______ বৃষ্টি এল।

১০.৫ সে গাছকোমর বেঁধে আমাদের ______ গাছে উঠে যায়।

শব্দঝুড়ি
আগে আগে, মাঠে মাঠে,
ছুঁয়ে ছুঁয়ে,কাঁপতে কাঁপতে,
যেতে না যেতে

অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৬৫-১৯২৩) : জন্মস্থান বরিশাল জেলার বাটাজোড় গ্রাম। পেশায় শিক্ষক, দৃঢ়চেতা অশ্বিনীকুমার ছিলেন বহু ভাষাবিদ, সুপণ্ডিত। তিনি *বরিশালের গান্ধি* নামে খ্যাত ছিলেন। *ভক্তিযোগ, কর্মযোগ* ইত্যাদি বইয়ে তাঁর জ্ঞানের স্বাক্ষর রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে অশ্বিনীকুমার দত্ত সমাজসেবা এবং দেশসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সেজোপিসিমার টমবয় মেয়ে — ‘টমবয় মেয়ে’ বলতে এককথায় বলা যেতে পারে ডানপিটে বা দুর্দান্ত প্রকৃতির মেয়ে। যে মেয়েরা সাধারণত হই হই করে বিপজ্জনক খেলা খেলতে ভালোবাসে তাদের এই নামে ডাকা হয়। আলোচ্য পাঠ্যাংশে সেজোপিসিমার দুরন্ত, সাহসী মেয়েটিকে তার লাগামছাড়া স্বভাবের জন্য ‘টমবয়’ বলা হয়েছে।

১১. 'আমি কাশীপুর, চাঁদপুর, ফতেপুর, বদরপুর, শিবপুর, অনুরাধাপুর—পৃথিবীর যত আছে লিখে পোড়ালাম।' — বিভিন্ন শব্দের শেষে '-পুর' শব্দটি যোগ করে বাংলার প্রচুর স্থান নাম তৈরি করা যায়। এখানে উল্লেখ নেই এমন আরো অন্তত পাঁচটি তোমার চেনা জায়গার নাম লেখো যাদের নামের শেষে '-পুর' আছে। এছাড়া আরও কিছু শব্দ শেষে বসে বিভিন্ন জায়গার নাম তৈরি হতে পারে। যেমন- 'নগর', 'গঞ্জ', 'হাটা', 'গাছা/গাছি', 'তলা', 'গুড়ি', 'ডোবা/ডুবি', 'ডাঙা' প্রভৃতি। এই ধরনের একটি করে নাম দেওয়া থাকল, তুমি আরও কিছু নাম যোগ করে নীচের ছকটি সম্পূর্ণ করো :

-নগর	অশোকনগর
-গঞ্জ	ডালটনগঞ্জ,
-হাট/হাটা	গড়িয়াহাট/দিনহাটা,
-গাছি/গাছিয়া	সারগাছি/বেলগাছিয়া,
-গ্রাম/গাঁ	নন্দীগ্রাম/বনগাঁ,
-তলা	বটতলা,
-গুড়ি	ময়নাগুড়ি,
-ডাঙা	বেলডাঙা,
-ডোব/ডুবি	আমডোব/ফুলডুবি,
-দহ/দা	শিয়ালদহ/খড়দা,
-পাড়া	বিশরপাড়া,
-খালি	কৈখালি,
-ঘরিয়া	তেঘরিয়া,
-পল্লি	বিধানপল্লি,
-বাজার	ইংলিশবাজার,

১২. **নীচের বাক্যগুলির কর্তা খুঁজে বের করো :**

১২.১ আমাদের দলটা এবার ছোটোপিসিমার বাড়ি হয়ে সেজোপিসিমার বাড়ি যাবে।

১২.২ পড়ন্তবেলায় আমরা অশ্বিনীকুমার দত্তের গ্রাম বাটাজোড় ছাড়ালাম।

১২.৩ সেটাও হাওয়ার দমকে উলটে গেল।

১২.৪ আমি হনহন করে পা চালালাম।

১২.৫ বেশ হই হই করে পথ চলছিলাম।

১৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১৩.১ ছোটোপিসিমার বাড়ি যাওয়ার পথের বর্ণনা করো।

১৩.২ বড়োপিসিমার বাড়ি যাওয়ার পথে ঝড়-বৃষ্টি এবং কই মাছ ধরার বিবরণ দাও।

১৩.৩ বড়োপিসিমার বাড়ি থেকে ফেরার সময় প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে ফাঁকা মাঠে কথকের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা লেখো।

১৩.৪ পাঠ্যাংশের নামকরণে 'অ্যাডভেঞ্চার' শব্দটির ব্যবহার কতটা যথাযথ হয়েছে, মতামত দাও।

১৩.৫ কোনো একটি বৃষ্টিমুখর দিনের কথা লেখো।

১৪. নীচের দুটি ছবির মধ্যে ছয়টি অমিল খুঁজে বের করো :

ছবি : দেবাশিস রায়

১৫. নীচের সূত্রগুলি কাজে লাগিয়ে শব্দছকটি পূরণ করো :

১					২			
							৩	
	৪		৫					
৬				৭				
			৮					
৯					১০	১১		
			১২					১৩
		১৪				১৫		
	১৬			১৭	১৮			
		১৯					২০	

পাশাপাশি

(১) 'মাটির উঁচু পথের দুপাশে নানা উচ্চতার _______ ক্ষেত' (৪) বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক (৬) 'পাটক্ষেতের নীল হাওয়া এসে *তাপ* উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে' (সমার্থক শব্দ লেখো) (৭) চাঁদসির _______ (৯) অশ্বিনীকুমার দত্তের গ্রাম (১০) 'আমাদের _______ জনের তাপ্পিমারা একটামাত্র ছাতা' (১২) 'তাড়াতাড়ি গা _______ মুছে পুরু কাঁথার মধ্যে সেঁধিয়ে গেলাম' (১৫) 'সেটাও _______ -র দমকে উলটে গেল' (১৬) 'ঠিক হলো আমাদের _______ -টা এবার ছোটোপিসিমার বাড়ি হয়ে সেজোপিসিমার বাড়ি যাবে' (১৭) 'সে গাছ _______ বেঁধে আমাদের আগে আগে গাছে উঠে যায়' (১৯) 'দেড়-দুই কুড়ি _______ সেই উলটানো ছাতার মধ্যে ভরে ফেললাম' (২০) সেজোপিসিমার মেয়ের মাথা ছিল _______ ।

উপর-নীচ

(১) '_______ র মতো শিস দিতে পারি' (২) যাদের বাড়ি যাওয়া হয়েছিল সম্পর্কে তাঁরা কথকের _______ (৩) শেষে -পুর আছে এমন একটি জায়গার নাম (৫) 'অপরাহ্নে হঠাৎ মেঘ উঠল যেন _______ ঘাস দিয়ে বোনা পাখির বাসা' (৬) 'একটা _______ পর্যন্ত নেই' (৮) ' _______ ছোটোমা আমাকে ওই ঝড়জলের মধ্যে দেখে অবাক' (১১) সেজোপিসিমার গ্রামের নাম (১৩) 'জলের _______ কতদূর পর্যন্ত আমাদের ঘিরে আছে' (১৪) তার নাকে _______ (১৮) '_______ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে'।

সমাধান : পাশাপাশি— (১) পাট, (৪) অশ্বিনীকুমার দত্ত, (৬) গরম (৭) লোহার পুল (৯) বাটাজোড় (১০) পাঁচ (১২) মাথা (১৫) হাওয়া (১৬) দল (১৭) কোমর (১৯) কই (২০) ন্যাড়া

উপর-নীচ— (১) পাখি (২) পিসিমা (৩) বদরপুর (৫) নীল (৬) গরুবাছুর (৮) বড়োমা (১১) চন্দ্রহার (১৩) ছায়া (১৪) নোলক (১৮) মন।

১৬. মনে করো এই পাঠ্যাংশের অ্যাডভেঞ্চারের তুমি-ই মূল চরিত্র। পাঠ-অনুসরণে নীচের ছবিটির বিভিন্ন স্থানে নির্দিষ্ট খোপে স্বাধীন ও যথাযথ বাক্য লিখে একটি গল্পের চেহারা দাও :

চন্দ্রহার

বাটাজোড়

৩

৪

২

৫

১

৬
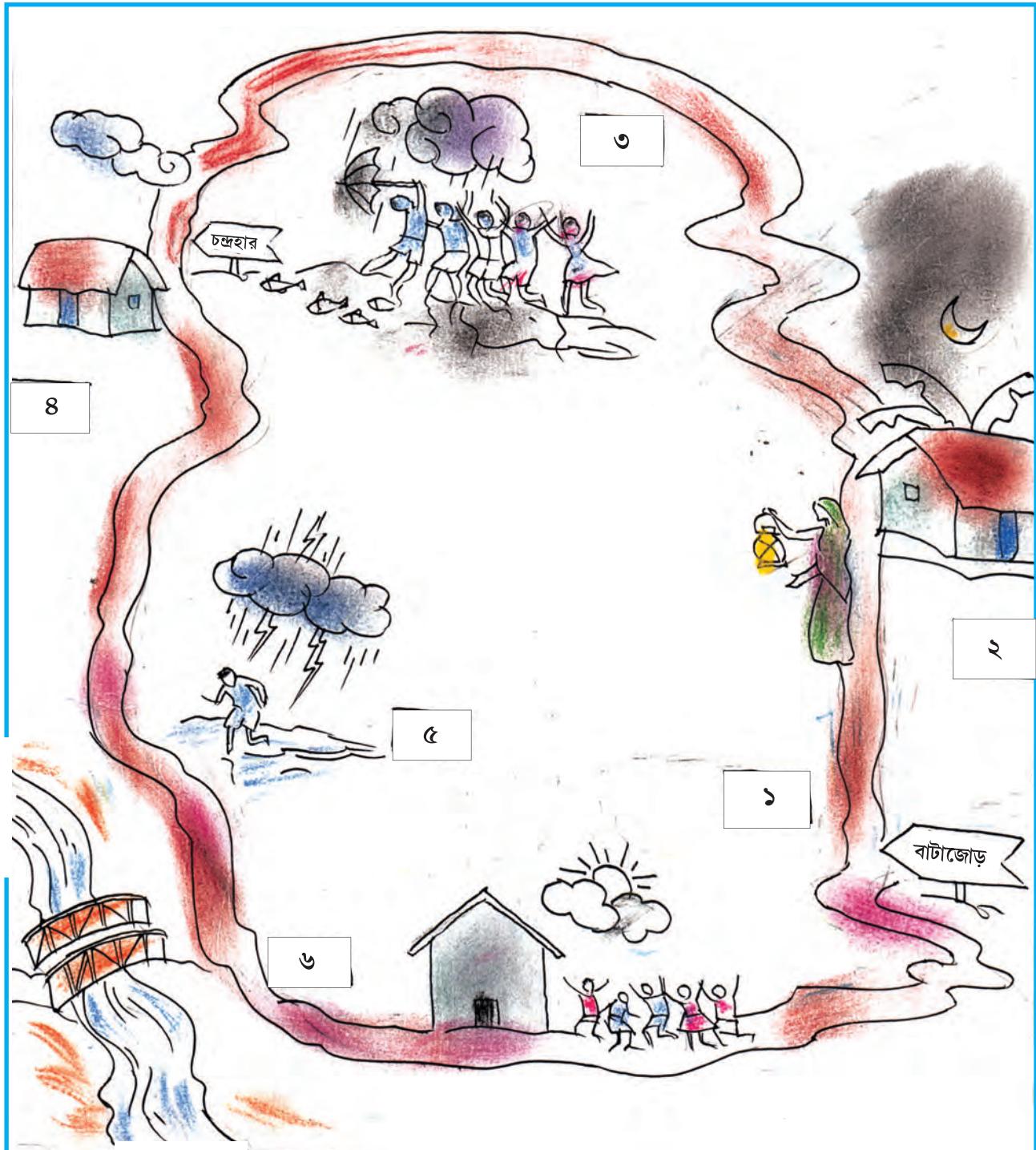
ছবির ধাঁধা

সুবিনয় রায়চৌধুরী

অংশহারা ছবি

১। টা—খ—
২। ক—ম—
৩। কা—প—
৪। টে—ছু—
৫। র—জী—ছ—
৬। ম—সা—দু

পাশের ৬টি ছবি থেকে একটি করে জিনিস বা অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে; ছবির নামের ও প্রত্যেক কথার প্রথম অক্ষরটি মাত্র দেওয়া হয়েছে। তোমরা বলতে পার কি, কোন ছবি থেকে কী বাদ পড়েছে আর কোন ছবির কী নাম?
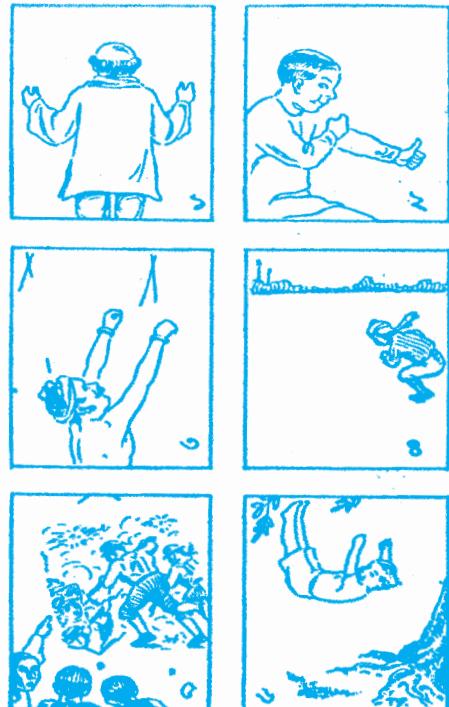
কী করছে?

পাশে যে কয়টি ছবি দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে একটি লোক কোনো একটি কাজ করছে (খেলা, বাজনা বাজানো বা অন্য কোনো কাজ) দেখানো হয়েছে। পাছে পোশাক দেখে বোঝা যায় কী কাজ করছে, তাই সব ছবিতেই একরকমের পোশাক দেওয়া হয়েছে। কোন ছবির লোকটি কী কাজ করছে তাই দেখানো হয়েছে, বলতে পারো কি?
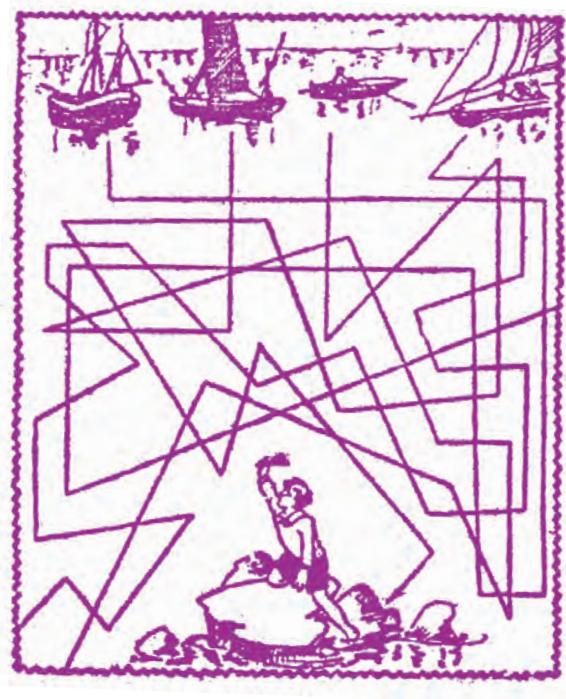
বিপদে ত্রাণ

ছেলেটি সমুদ্রে আটকা পড়েছে; নৌকাগুলি তাকে উদ্ধার করতে আসছে। আসবার রাস্তা আঁকাবাঁকা লাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে। চারটি নৌকার কোনটি ছেলের কাছে পৌঁছোবে, বলত।

লুকোনো জন্তু

জঙ্গলে কত জন্তু লুকানো আছে দেখো? একটু খুঁজে দেখলেই পাবে।

লুকোনো বন্ধু

খরগোশ বলছে,---'বন্ধুরা গেল কোথা?' বামন বলছে, ---'সবাই লুকিয়ে আছে।' তাদের খুঁজে বের করো।

গোলক ধাঁধা

নীচের বাঁ দিকের কোণ থেকে মাঝখানে হাতির কাছে যাও। বেড়া ডিঙিয়ে যেতে পারবে না।
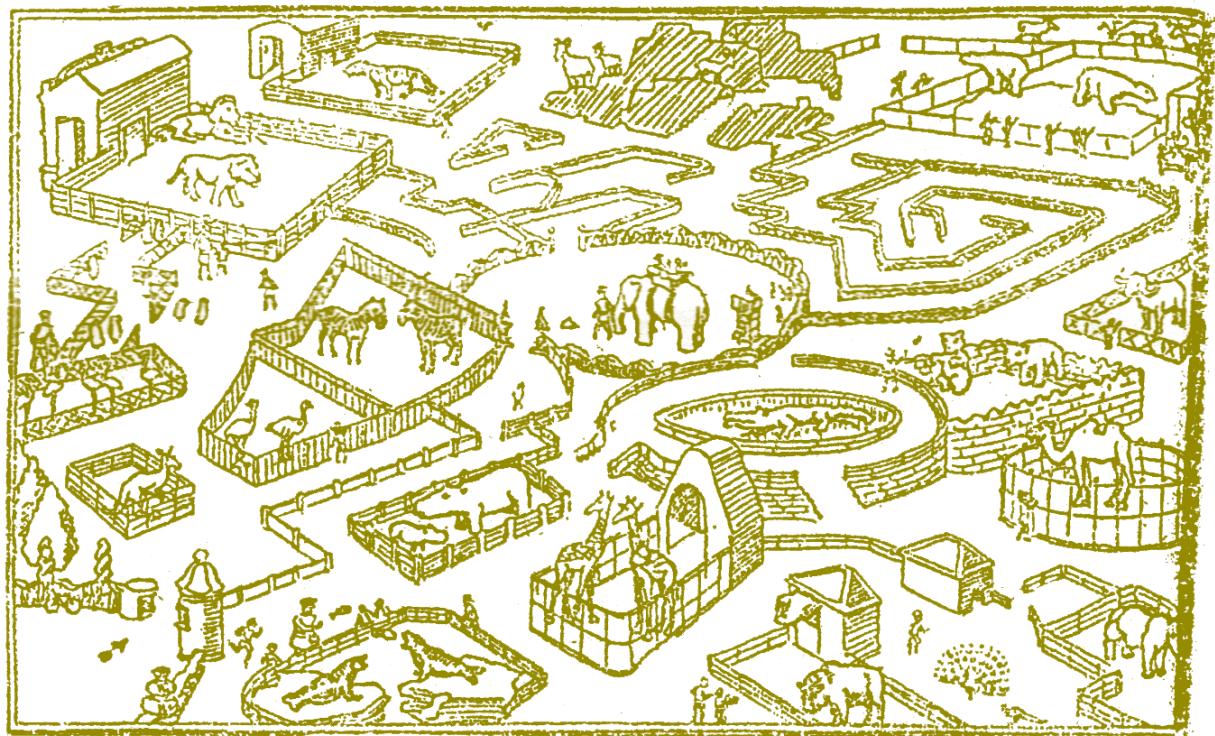
খাঁচার পথ !

নীচের বাঁ দিকের কোণ থেকে, আঁকাবাঁকা পথে, মাঝখানে পাখির খাঁচায় যেতে হবে। পথ খুঁজে বের করো।
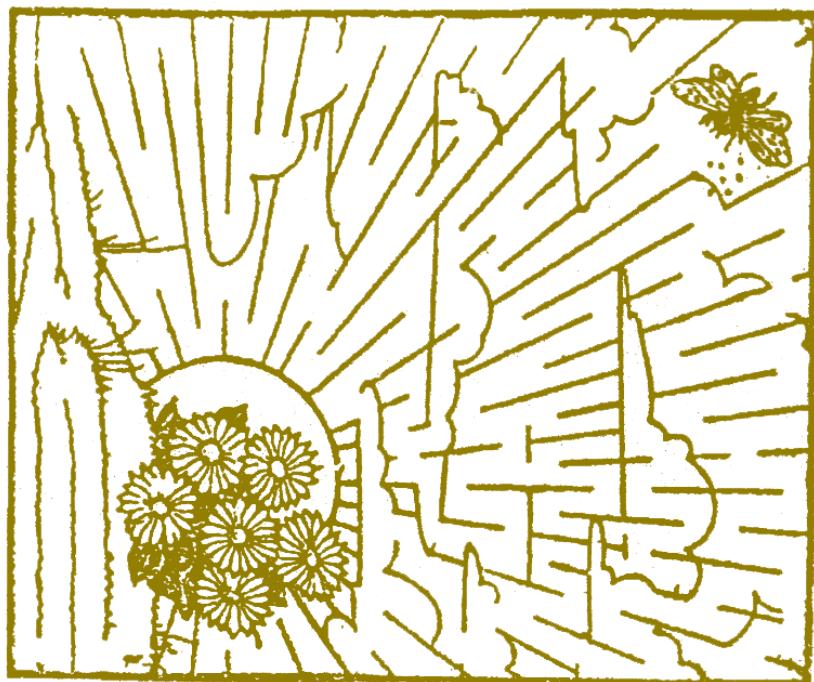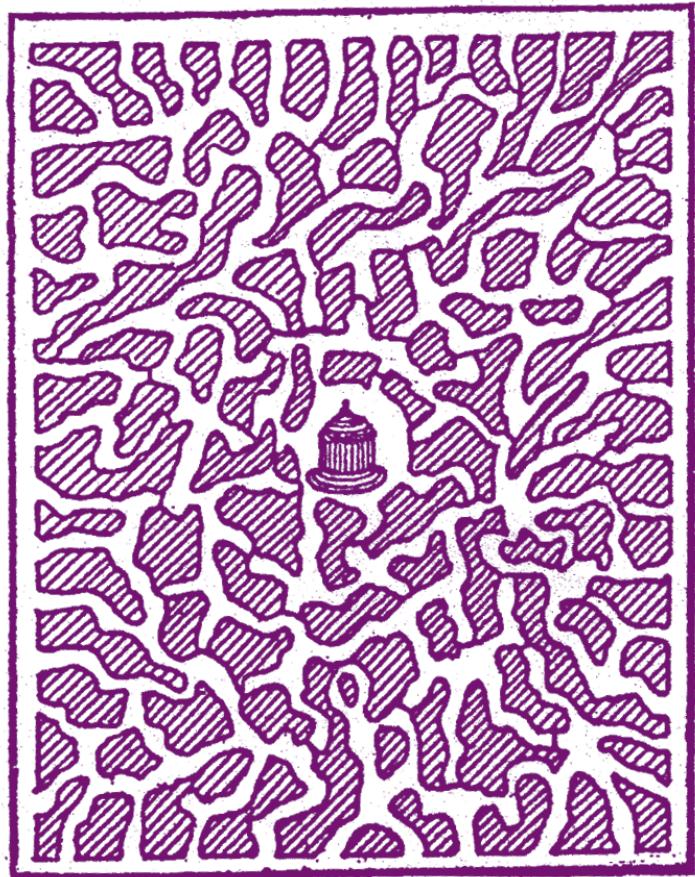
মৌমাছির পথ

মৌমাছি কোন পথে ফুলের কাছে যাবে বলতে পারো? বেড়া ডিঙিয়ে যাবার জো নেই।

উত্তর

অংশহারা ছবি :

১। টাটকা খবর

২। কলার মজা

৩। কাচার পরে

৪। টেনে ছুট

৫। রণের জীবন্ত ছবি

৬। ‘মনের সাধে দুলি’
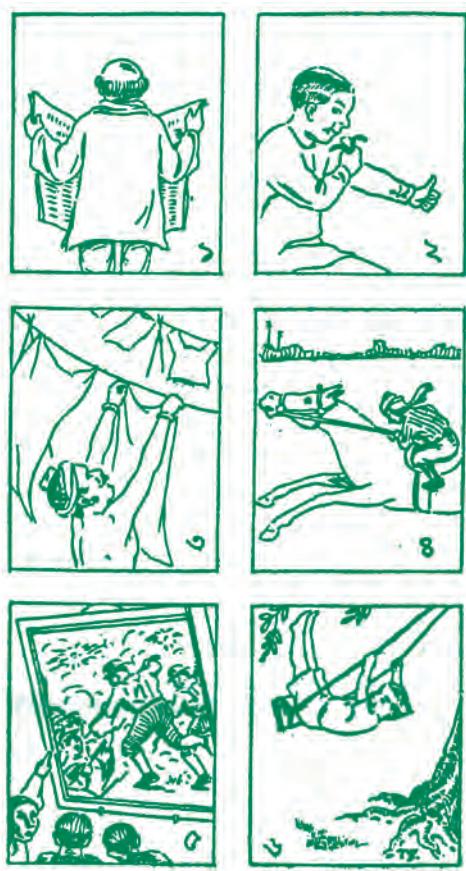
অংশ বাদ :

১। খবরের কাগজ

২। কলা

৩। দড়ি এবং কাপড়

৪। ঘোড়া

৫। ছবির ফ্রেম

৬। দোলনা

কী করছে ?

১। ফুটবল খেলায় ‘হেড’ করছে, ২। ছিপ নিয়ে মাছ ধরছে, ৩। টেনিস খেলছে, ৪। খোলক, ঢোল জাতীয় বাদ্য বাজাচ্ছে, ৫। মোটর চালাচ্ছে, ৬। ঝাঁট দিচ্ছে, ৭। হা-ডু-ডু খেলছে, ৮। বেহালা বাজাচ্ছে, ৯। রিকশা টানছে।

বিপদে ত্রাণ !

ছোট্ট, পালহীন ডিঙি নৌকা ছেলের কাছে পৌঁছোবে।

খরবায়ু বয় বেগে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
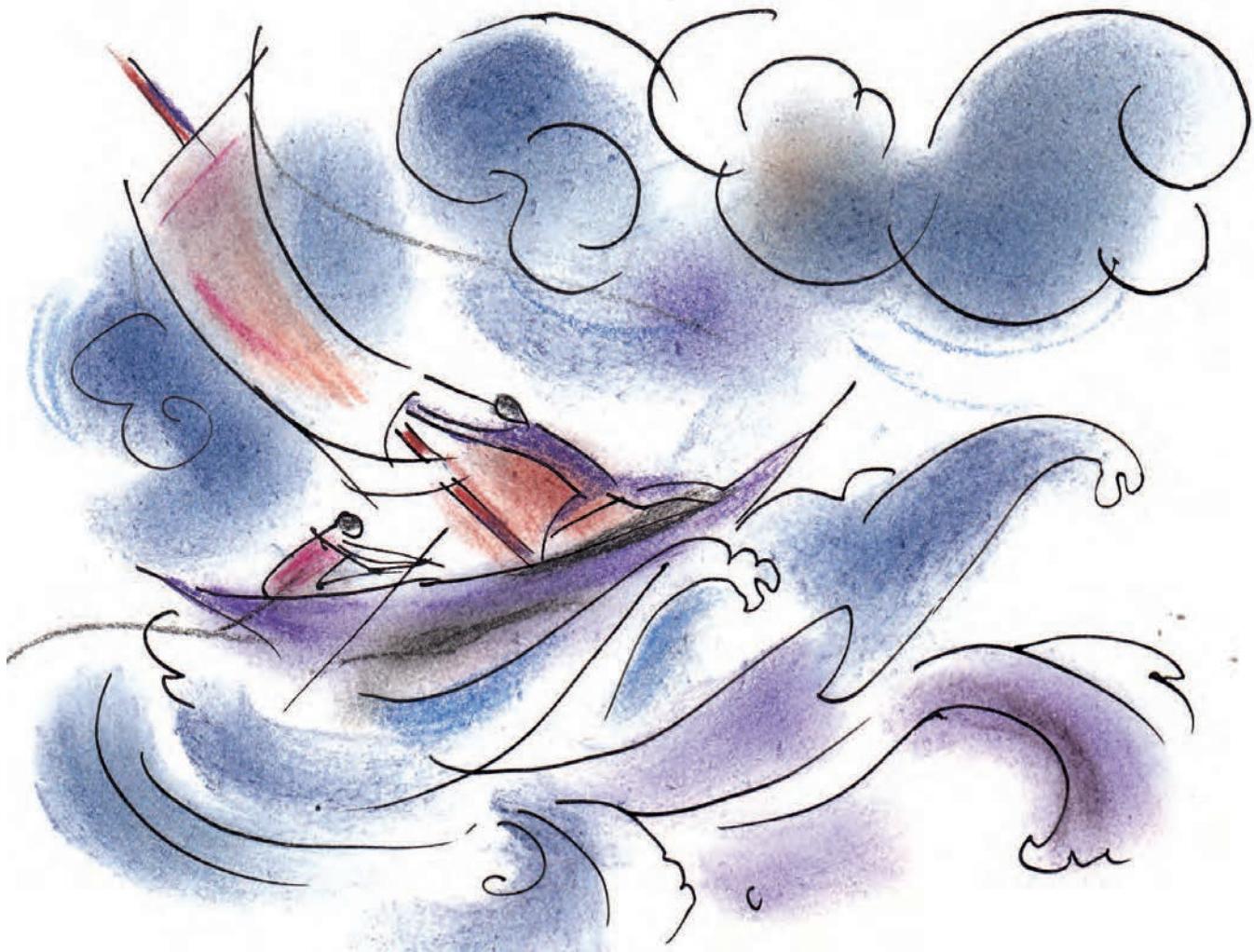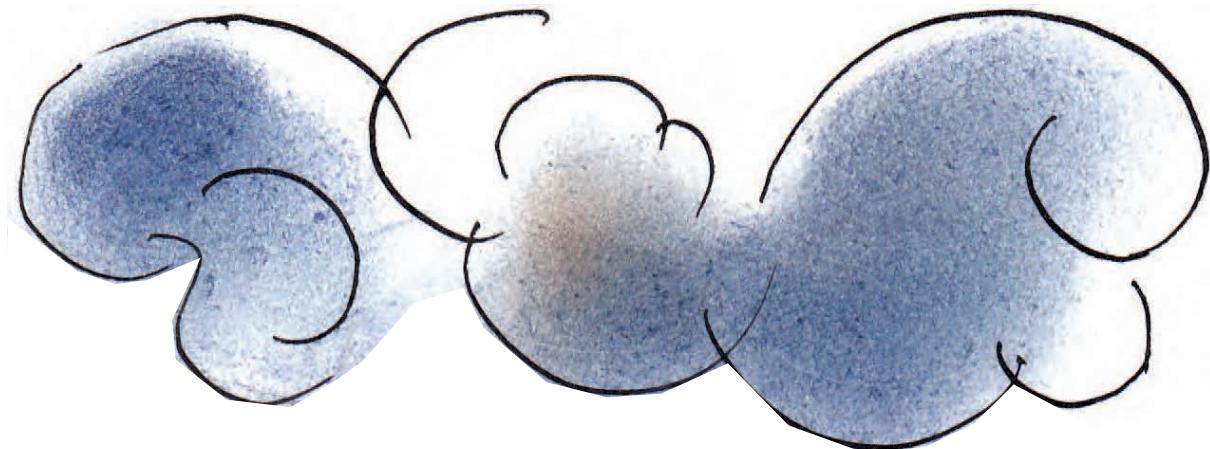
খরবায়ু বয় বেগে, চারি দিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি কষে ধরো হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।
শৃঙ্খলে বারবার ঝনঝন ঝংকার নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার—
বন্ধন দুর্বার সহ্য না হয় আর, টলোমলো করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো,মারো টান হাঁইয়ো।
গণি গণি দিন ক্ষণ চঞ্চল করি মন
বোলো না 'যাই কী না যাই রে'।
সংশয় পারাবার অন্তরে হবে পার,
উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল ঝড়ে হয় লুন্ঠিত,ঢেউ উঠে উত্তাল,
হয়ো নাকো কুন্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল — জয়-জয় জয়গান গাইয়ো।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।

আমার মা-র বাপের বাড়ি

রাণী চন্দ

মা জলের দেশের মেয়ে, তবু জলের দোলা সইতে পারেন না। নৌকোতে উঠলেই তাঁর মাথা ঘোরে, বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দিদিরও তাই। মা আর দিদি নৌকোর ভিতরে বিছানা পেতে শুয়ে পড়েন। ছোটোভাইকে মা কোলের কাছেই শুইয়ে-বসিয়ে রাখেন। আমি দাদাদের সঙ্গে মামার সঙ্গে 'ছই'-এর বাইরে এসে বসে থাকি।

এক মাঝি পিছন দিকে হাল ধরে বসে থাকে, দুই মাঝি সামনের দিকে দু-পাশে বসে বৈঠা বায়।

বসে বসে দেখি।

সকাল পেরিয়ে যায়। ধলেশ্বরী নদীতে নৌকো এসে পড়ে।

এই ধলেশ্বরী পাড়ি দেওয়াই এক বিষম আতঙ্কের ব্যাপার। মা চোখ বুজে শুয়ে থেকে থেকেই বলে ওঠেন– ‘ধলেশ্বরী আইলো নাকি ও—ও মাঝি ভাই?’

ধলেশ্বরী এসেছে শুনে মা চোখ দুটো টিপে বালিশের ভিতর মাথাটা আরও গুঁজে দেন।

মাঝিরাও ত্রস্ত হয়ে ওঠে। বড়ো মাঝি আকাশের দিকে তাকায়, হাওয়ার দিক লক্ষ করে , জলের গতির উপরে নজর রাখে, পরে তিন মাঝি স্বর মিলিয়ে ‘বদর বদর হৈ’ বলে নৌকোয় পাল তুলে দেয়।

ধলেশ্বরীর ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ে নৌকোর গায়ে। ঘোলা জল—বিরাট নদীর একূল ওকূল দু-কূল ভরা জলে। ভেবে পাই না মাঝিরা নৌকো নিয়ে চলেছে কোন দিকে।

সবাই এক আতঙ্কে স্থির বসে। কথা নেই কারো মুখে। মাঝিরা শুধু থেকে থেকে হুংকার দিয়ে ওঠে—‘বলো ভাই—বদর বদর হৈ’।

ধলেশ্বরী খ্যাপা নদী। তালে বেতালে চলে। এলোপাতাড়ি ঢেউয়ের ধাক্কা কখনও এদিক হতে এসে লাগে, কখনও ওদিক হতে । চলার তাল ঠিক রাখতে জানে না ধলেশ্বরী। তাই হুঁশিয়ার থাকে মাল্লামাঝি যাত্রীভরা নৌকো নিয়ে।

ধলেশ্বরী পাড়ি দিয়ে শান্তধারায় নৌকো আসে। মা উঠে বসেন। বলেন, ‘মাঝি ভাই রে—পাড়ে একটু লাগাও নৌকো, দুই পা একটু হাঁটি।’

নৌকো পাড়ে লাগে। টুপটাপ ভাইবোনেরা নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ি। পাড়ে নলখাগড়ার বন, বালির চর—ছুটোছুটি করি। গত রাত্রের রান্না করে আনা লুচি আলুরদম হালুয়া জলের ধারে বসে খাই। খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে আবার নৌকোয় উঠি।

এবার মাঝিরা নিশ্চিন্ত মনে জলে নৌকো ভাসায়। এক মাঝি নৌকোর পিছন দিকের পাটাতন তুলে নীচে রাখা মাটির উনুনে কাঠ জ্বালে। একটা মাটির মালসাতে করে নদীর জলে চাল ধোয়। পরে

চালে জলে মাটির হাঁড়ি ভরে জ্বলন্ত উনুনে বসিয়ে দেয়। লাল লাল মোটা মোটা চাল দেখতে দেখতে টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করে ।

ভাত হয়ে গেলে মাটির কড়াইতে মাছের ঝোল রাঁধে। বেশিরভাগ সময়ে ইলিশ মাছই থাকে। পথে আসতে আসতে এক সময়ে কিনে নিয়েছে জেলেডিঙা থেকে। নুন মাখানো মাছে একটু হলুদবাটা আর কাঁচালংকা ছেড়ে রান্না করা মাছের ঝোলের সুগন্ধ ভুরভুর করে। মাঝিরা একে একে মাটির থালায় ভাত বেড়ে খেয়ে নেয়। হাত বাড়িয়ে নদীর জলে থালা, বাটি, হাঁড়ি, কড়াই সব ধুয়ে আবার তুলে রাখে পাটাতনের নীচে।

ধীরে মন্থরে হেলে-দুলে নৌকো চলে। মাথার উপরে গাঙচিল উড়ে উড়ে চলে। শুশুক ওঠে ক্ষণে ক্ষণে জলের উপর—নিশ্বাস নিতে। একমনে দেখতে থাকি।

সূর্যের তাপে মাঝিদের গায়ের ঘাম শুকিয়ে কালো পিঠে 'সাদা' ফুটে ওঠে। মা বলেন—'নুন ফুটে উঠেছে'। মাঝিরা নাকি নুন বেশি খায়—তাই এমনিভাবে নুন ফুটে ওঠে গায়ে।

মা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, বেলার দিকে তাকিয়ে মাঝিদের তাড়া দেন—' মাঝি ভাই রে—অ মাঝি ভাই—বেলা থাকতে থাকতে পৌঁছাইয়া দিবা। তাড়াতাড়ি বাও'।

ইছামতী—যেন লক্ষ্মী মেয়েটি। অতি শান্ত তার চলার গতি। ইছামতীতে এলে পর তীরের দিকে নৌকো সরিয়ে এনে কম জল দেখে দুজন মাঝি হাঁটু-জলে লাফিয়ে পড়ে। হাতে তাদের মোটা দড়ি, মোটা কাঠি। তীরে উঠে এবারে তারা 'গুণ' টানতে থাকে। নৌকোয় বাঁধা লম্বা দড়ির আর এক মাথা মোটা কাঠির সঙ্গে বেঁধে কাঠিটা ঘাড়ে চেপে ধরে নদীর পাড় দিয়ে চলতে থাকে মাঝিরা। সে রশির টানে নৌকোও এগিয়ে চলে জলের উপরে তরতর করে।

চলতে চলতে বাঁদিকে উঁচু পাড়ে বটগাছের ছড়ানো শিকড় ধুয়ে যে খাল এসে পড়েছে ইছামতীর বুকে—সেই খালের মুখে নৌকো ঢোকে। মাঝিরা এবারে 'গুণ' 'বৈঠা' তুলে রেখে 'লগি' তুলে নেয় হাতে। খালের জলে লগি ঠেলে ঠেলে নৌকো এগিয়ে নিয়ে চলে।

খালের ধারে বাবন খাঁ দাদার বাড়ি। দাদামশায়ের বন্ধু ছিলেন বাবন খাঁ। বড়োভাইয়ের মতো দেখতেন ইনি দাদামশায়কে। মা ডাকতেন 'বাবনচাচা' বলে।

বাবনচাচার বড়ো ছেলে আলি হোসেন খাঁ। খালের জলে নৌকো আসতে দেখে হোসেনমামা হুঁকো টানতে টানতে এগিয়ে আসেন, বলেন, 'কার বাড়ির *নাইওরি* লইয়্যা যাও রে মাঝি?'

মা ছইয়ের বাইরে মুখ বের করে বলেন— 'আমি গো—হোসেনভাই।'

মাকে দেখে হোসেনমামা একমুখ হাসেন, বলেন— 'পুণি বইনদি যাও? তাই কও।'

মার নাম 'পূর্ণশশী', তাই ছোটো করে 'পুণি' বলেই ডাকেন মাকে বড়োরা।

হোসেনমামা ছুটে গিয়ে বাড়িতে ঢুকে এক কাঁদি পাকা কলা এনে নৌকোতে তুলে দেন। হাঁকডাক করে গাছ থেকে দুটো কাঁঠালও পাড়িয়ে দেন। বলেন 'পোলাপান লইয়্যা খাইও তুমি বাড়িতে গিয়া।'

খালের বাঁকে বাঁকে জোলা, ভুঁইমালী, শেখমামাদের বাড়ি। নৌকো খালে ঢুকতে দেখেই তারা এগিয়ে আসে—কে আইলো?—না বোসের বাড়ির পুণি বইনদি আইলো।

মুখে মুখে বার্তা চলতে থাকে। মা বাপের বাড়িতে পা দেওয়ার আগেই দিদিমার কাছে খবর পৌঁছে যায়। 'টান' -এর দিনে বাড়ির ঘাট অবধি আসে না নৌকো। ডাঙা-পথে দিদিমারা এগিয়ে আসেন মুরলী ঘোষের বাঁশঝাড় অবধি। নৌকো যখন এসে থামে —ততক্ষণে দস্তুরমতো ভিড় সেখানে ।

গরমের ছুটিতে গ্রামে ঢুকি আমরা এই পথে। পুজোর ছুটিতে ঢুকি জল-ভরা বিলের উপর দিয়ে।

সেসময় তখনও বর্ষার জল সরে যায় না সব। ঢালু জমিতে থইথই জল। নন্দীদের বাঁধানো ঘাট থেকে ধু ধু বিল দেখা যায় বহুদূর পর্যন্ত। নৌকো এগিয়ে আসছে দেখতে পেয়েই হাঁকহাঁকি পড়ে যায় ঘাটে।— কার বাড়ির কুটুম আসছে — কার বাড়ির নাইওরি? পাড়ার লোক ছুটতে ছুটতে এসে জমে ঘাটে। গ্রামের মেয়ে বউ আসছে গ্রামে — এ আনন্দ যেন এদের সকলের। বধূরা বাদে গ্রামের আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলে এসে ভিড় করে ঘাটে। দূর হতে দেখা যায় সেই ভিড়। মা ততক্ষণে ছইয়ের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। এখন আর মাথা ঘোরানোর কথা মনে নেই তাঁর ।

বর্ষার জমা জল—অসুবিধা নেই কোনো, একেবারে বাড়ির ঘাটে এসে লাগে নৌকো। সঙ্গে সঙ্গে গোটা গ্রাম ভেঙে পড়ে আমাদের ঘিরে। ঘর পর সকলের সমান উল্লাস—যেন সবার ঘরেই কুটুম এল আজ। হই-চই উচ্ছ্বাস আনন্দে কেটে যায় বাকি বেলাটুকু ।

সন্ধেবেলার শাঁখ বেজে ওঠে ঘরে ঘরে। যে যার বাড়ি ফিরে যায়। আমরাও হাত মুখ ধুয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করে ঘরে ঢুকি।

হাতেকলমে

রাণী চন্দ (১৯১২—১৯৯৭) : রাণী চন্দ অল্প বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। রবীন্দ্র পরবর্তীযুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং অন্যতম সাহিত্যিক। তিনি বিশ্বভারতীর কলেজ অফ ফাইন আর্টস-এ শিক্ষাগ্রহণ করেন। দেশের প্রথম মহিলা শিল্পী হিসাবে দিল্লি ও মুম্বাইতে একক চিত্র প্রদর্শনীর গৌরব অর্জন করেন। দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবন সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের রাজভবনগুলিতেও তাঁর সুন্দর শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে। তাঁর রচিত বইগুলির মধ্যে — *জোড়াসাঁকোর ধারে, পূর্ণকুম্ভ, ঘরোয়া, সব হতে আপন, আমার মা-র বাপের বাড়ি* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। লেখিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের *ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক* এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক *ডক্টরেট* উপাধি পেয়েছিলেন।

১. রাণী চন্দের লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

২. তিনি কী কী সাম্মানিক উপাধি পেয়েছিলেন?

৩. শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে উপযুক্ত স্থানে বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

৩.১ লাল লাল মোটা মোটা চাল দেখতে দেখতে ______ করে ফুটতে আরম্ভ করে।

৩.২ ঢালু জমিতে ______ জল।

৩.৩ নন্দীদের বাঁধানো ঘাট থেকে ______ বিল দেখা যায় বহুদূর পর্যন্ত।

৩.৪ নৌকোও এগিয়ে চলে ______ করে।

শব্দঝুড়ি
থই থই, তরতর, ধু ধু, টগবগ

৪. ডানদিক ও বামদিকের স্তম্ভদুটি মেলাও :

ক	খ
বসে বসে	পৌঁছাইয়া দিবা।
হোসেনমামা হুঁকো টানতে টানতে	নৌকা চলে।
গাঙচিল উড়ে উড়ে	এসে ঘাটে জমে।
ধলেশ্বরীর ঢেউ আছড়ে আছড়ে	এগিয়ে আসেন।
খালের জলে লগি ঠেলে ঠেলে	দেখি।
বেলা থাকতে থাকতে	পড়ে নৌকার গায়ে।
পাড়ার লোক ছুটতে ছুটতে	চলে।

৫. নীচের বাক্যগুলিতে কোন বচনের ব্যবহার হয়েছে লেখো :

৫.১ মা জলের দেশের মেয়ে।

৫.২ তিন মাঝি স্বর মিলিয়ে ‘বদর বদর হৈ’ বলে নৌকায় পাল তুলে দেয়।

৫.৩ গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা এসে ভিড় করে ঘাটে।

৫.৪ যে যার বাড়ি ফিরে যায়।

৫.৫ বাবনচাচার বড়ো ছেলে আলি হোসেন খাঁ।

৫.৬ সন্ধেবেলার শাঁখ বেজে ওঠে ঘরে ঘরে।

৫.৭ গোটা গ্রাম ভেঙে পড়ে আমাদের ঘিরে।

৫.৮ শুশুক ওঠে ক্ষণে ক্ষণে জলের উপর।

৫.৯ ধলেশ্বরী খ্যাপা নদী।

৫.১০ মাঝিরা নাকি নুন বেশি খায়।

৬. ‘আমার মা’ বা ‘বাপের বাড়ি’ শব্দবন্ধদুটি দুটি করে শব্দ ‘আমি’ ও ‘মা’ এবং ‘বাপ’ ও ‘বাড়ি’-র যোগে তৈরি। খেয়াল করে দেখো প্রতিক্ষেত্রেই শব্দদুটি যুক্ত হয়েছে ‘-র’ বা ‘-এর’ ব্যবহার করে। অর্থাৎ, (আমি+র=আমার) এবং (বাপ+এর=বাপের)। এইভাবে ‘-র’ বা ‘-এর’ যোগ করে দুটি আলাদা শব্দের মধ্যে সম্বন্ধ তৈরি করা যায় বলে এমন পদগুলিকে বলা হয় ‘সম্বন্ধ পদ’। ‘-র’ বা ‘-এর’ যোগ করে সম্বন্ধ পদ তৈরি হয়েছে এমন কয়েকটি উদাহরণ পাঠ্যাংশটি থেকে খুঁজে বের করো। তোমাদের সুবিধের জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া থাকল। উদাহরণ : জলের দেশ।

৭. ‘আমার মা-র বাপের বাড়ি’- শব্দবন্ধনীটিতে তিনবার, ‘জলের দেশের মেয়ে’ শব্দবন্ধনীতে দুবার ‘-র’ বা ‘-এর’ ব্যবহার করে একটিমাত্র সম্বন্ধ পদ গড়ে তোলা হয়েছে। তোমরা এইরকম আরও পাঁচটি সম্বন্ধ পদ লেখো যেখানে অন্তত দুবার ‘-র’ বা ‘-এর’ ব্যবহার হয়েছে। এরপর নতুন তৈরি শব্দগুলি একটি করে স্বাধীন বাক্যে ব্যবহার করো।

উদাহরণ : গোপালের মাসির হাতের রান্না খেলে আর ভোলা যায় না।

৮. নির্দেশ অনুযায়ী পুরুষ পরিবর্তন করো :

৮.১ মাটির কড়াইতে মাছের ঝোল রাঁধে। (উত্তম পুরুষ)

৮.২ ভেবে পাই না মাঝিরা নৌকা নিয়ে চলেছে কোন দিকে। (প্রথম পুরুষ)

৮.৩ বসে বসে দেখি। (মধ্যম পুরুষ)

৮.৪ যে যার বাড়ি ফিরে যায়। (উত্তম পুরুষ)

৮.৫ পোলাপান লইয়্যা খাইও তুমি বাড়িতে গিয়া। (উত্তম পুরুষ)

৮.৬ পুণি বইনদি যাও ? (প্রথম পুরুষ)

৮.৭ এখন আর মাথা ঘোরার কথা মনে নেই তাঁর। (মধ্যম পুরুষ)

৮.৮ অতি শান্ত তোমার চলার গতি। (মধ্যম পুরুষ)

৮.৯ দুই পা একটু হাঁটি। (প্রথম পুরুষ)

৮.১০ 'বদর বদর হৈ' বলে নৌকোয় পাল তুলে দেয়। (উত্তম পুরুষ)

৯. নীচের শব্দগুলির বিপরীত লিঙ্গের শব্দ পাঠ্যাংশটি থেকে খুঁজে বের করো :

দাদি, মামি, ছোটোবোন, দিদিমা, বড়োছেলে, দিদি, বালিকা, বর, বৃদ্ধা, বান্ধবী, লক্ষ্মী ছেলে, চাচি।

শব্দার্থ : ছই — নৌকার ছাউনি। বায় — বেয়ে নিয়ে যাওয়া। বদর — পাঁচ পিরের অন্যতম বদরগাছি। জলযাত্রা যাতে নির্বিঘ্ন হয় সেইজন্য মাঝিরা এঁর নাম স্মরণ করেন। খ্যাপা — পাগল। তালে-বেতালে — ছন্দ সমেত ও ছন্দহীন হয়ে। গুণ টানা—দড়ি দিয়ে বেঁধে নৌকা টানা। পোলাপান — ছেলেমেয়ে। দস্তুরমতো — রীতিমতো। আবালবৃদ্ধবনিতা — বালকবৃদ্ধ নারী সকলেই। কুটুম — আত্মীয়। নাইওরি — পূর্ববঙ্গের কোনো বধূর নদীপথে বাপের বাড়ি যাত্রা।

১০. নীচের বাক্যগুলির কর্ম খুঁজে বের করো :

১০.১ মাঝিরা একে একে মাটির থালায় ভাত বেড়ে খেয়ে নেয়।

১০.২ হোসেনমামা এক কাঁদি পাকা কলা এনে নৌকাতে তুলে দেন।

১০.৩ এক মাঝি মাটির উনুনে কাঠ জ্বালে।

১০.৪ মাঝিরা নিশ্চিন্ত মনে নৌকা ভাসায়।

১০.৫ মা জলের দোলা সইতে পারেন না।

১১. রচনাংশ থেকে ঠিক ক্রিয়াপদ বেছে নিয়ে নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করো :

১১.১ মাঝিরা জলের গতির উপরে ______ ।

১১.২ ধলেশ্বরী নদী ______ ।

১১.৩ হই-চই উচ্ছ্বাস আনন্দে বাকি বেলাটুকু ______ ।

১১.৪ মুখে মুখে বার্তা ______ ।

১১.৫ মা আর দিদি নৌকোর ভিতরে ______ ।

১১.৬ 'রাম' নাম ______ ।

১১.৭ বেশির ভাগ সময়ে ইলিশ মাছই ______ ।

১১.৮ মা 'বাবনচাচা' ______ ।

১১.৯ কার বাড়ির 'নাইওরি' ______ রে মাঝি ?

১১.১০ তখনও বর্ষার সব জল ______ ।

১২. অনধিক দু-তিনটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

১২.১ পাঠ্যাংশে কাকে জলের দেশের মেয়ে বলা হয়েছে?

১২.২ 'ছই' বলতে কী বোঝো?

১২.৩ কাদের সঙ্গে ছই-এর বাইরে বসে থাকতে দেখা যায়?

১২.৪ কাদের 'বদর বদর হৈ' বলে চিৎকার করতে দেখা যায়?

১২.৫ কোন নদীকে 'খ্যাপা নদী' বলা হয়েছে?

১২.৬ বালির চরের প্রসঙ্গ পাঠ্যাংশে কীভাবে এসেছে?

১২.৭ নৌকোয় কী কী রান্না হয়েছিল?

১২.৮ নদীতে যেতে যেতে কোন কোন প্রাণীর দেখা মিলেছে?

১২.৯ 'গুণ টানা' বলতে কী বোঝো?

১২.১০ মাঝিরা কখন হাতে 'লগি' তুলে নেয়?

১২.১১ 'নাইওরি' কথাটির অর্থ কী?

১২.১২ হোসেনমামা কী কী উপহার এনেছিলেন?

১২.১৩ খালের বাঁকে বাঁকে কাদের কাদের বাড়ি চোখে পড়ে?

১২.১৪ গরমের ছুটি আর পুজোর ছুটিতে মামাবাড়িতে আসার পথ বদলে যায় কেন?

১৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১৩.১ লেখিকার মা-র বাপের বাড়ি লেখিকার কী? সেখানে যাওয়ার যাত্রাপথটি বর্ণনা করো।

১৩.২ পাঠটির অনুসরণে 'ধলেশ্বরী' নদীর পরিচয় দাও।

১৩.৩ নৌকোয় রান্নাবান্না ও খাওয়াদাওয়ার বিশদ বিবরণ দাও।

১৩.৪ পাঠ্যাংশ অনুসরণে 'ইছামতী' নদী সম্বন্ধে পাঁচটি বাক্য লেখো।

১৩.৫ লেখিকার দাদামশায়ের পরিবারের সঙ্গে বাবন খাঁ-দের পরিবারের সম্পর্ক কেমন ছিল? বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও।

১৩.৬ লেখিকার মাকে কেন জলের দেশের মেয়ে বলা হয়েছে?

১৩.৭ পাঠ্যাংশে বাংলার পল্লিজীবনের বিভিন্ন ধরনের মানুষের মিলেমিশে একসঙ্গে থাকার যে ছবি ফুটে উঠেছে তা নানা ঘটনা উল্লেখ করে লেখো।

১৩.৮ তোমার নৌ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো। যারা নৌকা চড়োনি তারা একটি কাল্পনিক নৌ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লেখো।

১৩.৯ তোমার দেখা দুটি নদী এবং সেখানে ও তার আশেপাশে থাকা বিভিন্ন প্রাণী আর উদ্ভিদ নিয়ে দুটি পৃথক অনুচ্ছেদ রচনা করো।

১৪. এই পাঠ থেকে তোমরা জেনেছ নৌকা চালানোর সময় কখনও বৈঠা বাওয়া হয়, কখনও গুণ টানা হয়, কখনও বা ঠেলা হয় লগি দিয়ে। নীচের ছবিটিতে বিভিন্ন যানবাহন এবং তাদের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের ছবি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। যন্ত্রগুলিকে তাদের নিজস্ব বাহনের সঙ্গে যোগ করো :
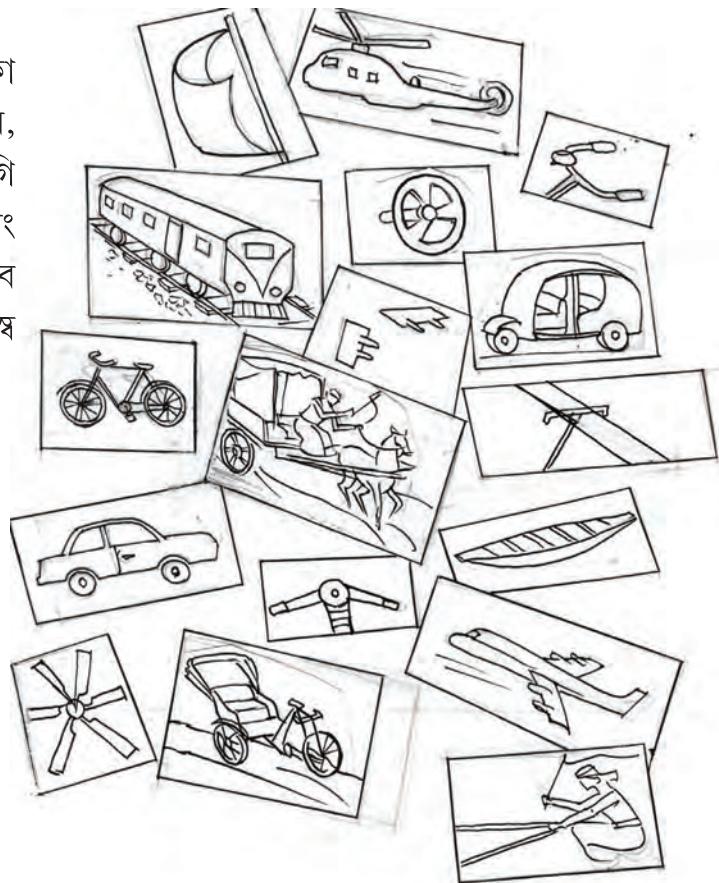
১৫. নীচের নৌকোগুলির মধ্যে যে নৌকোটি তোমার পছন্দ নিজের খাতায় তার ছবি আঁকো।
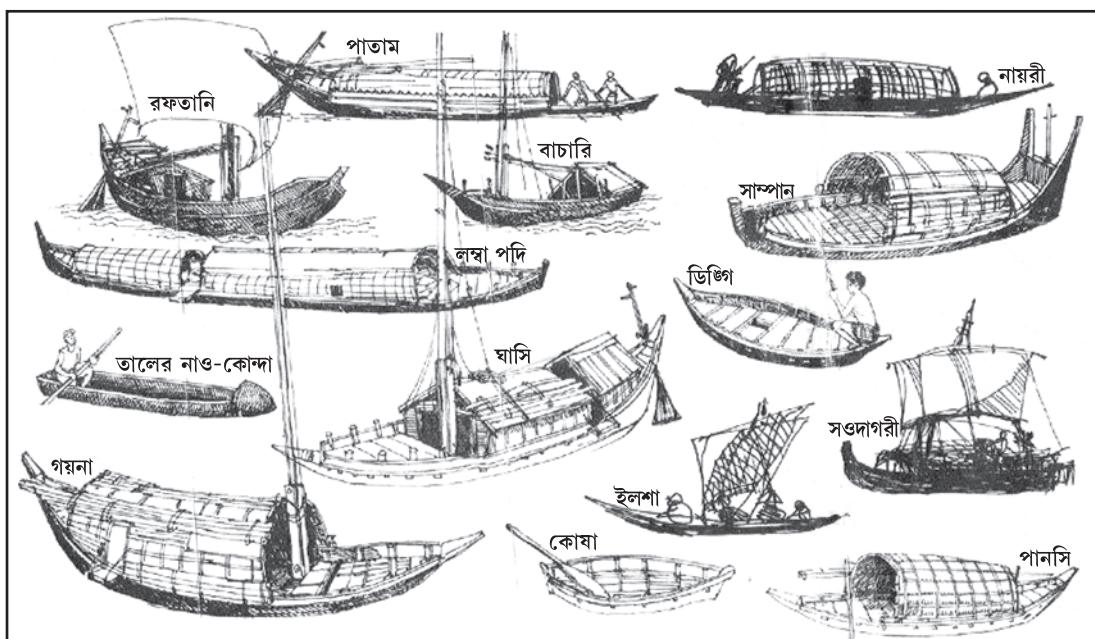
১৬. নীচের খেলাটি লুডোর মতো ছক্কা চেলে খেলতে হবে। একা কিংবা অনেকজন মিলে খেলাটি খেলা যেতে পারে। ছক্কার দান অনুযায়ী ঘুঁটি এগোবে, বিভিন্ন ঘরে লেখা নির্দেশ অনুসারে ঘুঁটি এগোবে অথবা পিছোবে। যে সবার আগে ১০০-সংখ্যক ঘরে পৌঁছোবে, সে জিতবে।

মা-র বাপের বাড়ি ১০০	৯৯	৯৮	৯৭	ঘাট অবধি জল তিনঘর এগোও ৯৬	৯৫	৯৪	৯৩	৯২	৯১
৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	মুখেমুখে খবর দুইঘর এগোও ৮৭	৮৮	৮৯	৯০
৮০	৭৯	৭৮	হোসেনমামার উপহার দশঘর এগোও ৭৭	৭৬	৭৫	৭৪	৭৩	৭২	৭১
৬১	লগি ঠেলা চারঘর পিছোও ৬২	৬৩	৬৪	৬৫	লগি ঠেলা দুইঘর পিছোও ৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০
৬০	৫৯	৫৮	৫৭	৫৬	৫৫	৫৪	গুণ টানা তিনঘর পিছোও ৫৩	৫২	৫১
৪১	৪২	ইছামতী পাঁচঘর এগোও ৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	চরে বনভোজন পাঁচঘর এগোও ৩৫	৩৪	৩৩	৩২	৩১
২১	২২	ধলেশ্বরীর ঘূর্ণি পাঁচঘর পিছোও ২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
২০	১৯	১৮	১৭	১৬	১৫	১৪	ধলেশ্বরীর ঘূর্ণি দশঘর পিছোও ১৩	১২	১১
১ আরম্ভ	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

১৭. <u>বড্ডো বেশি 'ব'</u>

নীচের ছবিটি থেকে অন্তত তিরিশটি বস্তু/ বিষয় খুঁজে বের করো যাদের নাম 'ব' দিয়ে শুরু :

মিলিয়ে পড়ো	আমার মায়ের বাপের বাড়িতে তোমরা পড়লে নদীতে নৌকো যাত্রার গল্প। সেরকমই আরেকটি ভ্রমণের কথা রইল এখানে।

নদীপথে

অতুল গুপ্ত

গৌহাটি থেকে রওনা হতে বেলা বাজল এগারোটা। বেলা দুটোরও পর পর্যন্ত ডাইনে পাহাড়ের সার চলছে নদীর প্রায় পাড় ঘেঁষে। নিবিড় বনে ঢাকা পাহাড়; হঠাৎ মাঝে মাঝে এক-একটা পাহাড়ের খানিকটা অনাবৃত কালো পাথরে মোড়া, প্রকাণ্ড ঐরাবতের পাশের মতো। এক সার পাহাড়ের পিছনে আর-এক সার, তারপর আবার এক সার, দূরে দূরে আরও-সব সারের মাথা দেখা যাচ্ছে, অতি পাতলা নীল ওড়নার মতো ফিকে নীল কুয়াশায় ঢাকা। এক জায়গায় একটা পাহাড় তার সঙ্গীদের ছেড়ে আড়াআড়ি সোজা চলে এসেছে জলের মধ্যে, নদীর সঙ্গে পরিচয় নিবিড় করতে। উলটো দিকের পাড় একটা চরের জিহ্বা অনেক দূর নদীর মধ্যে এগিয়ে দিয়েছে। এ জায়গাটা স্টিমার পার হলো অতি ধীরে ও সাবধানে।

বাঁ দিকের পাহাড় সব দূরে দূরে। তৃণলেশহীন উঁচু চর চলেছে মাইলের পর মাইল—ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গলাঞ্ছনা পাশে আঁকা। অনুজ্জ্বল রৌদ্রে মনে হচ্ছে যেন চুনারি পাথরে তৈরি। আজও আকাশে মেঘ আছে, তবে রোদকে ঢাকতে পারেনি, শুধু নিষ্প্রভ করেছে।

ডান দিকের পাহাড়ের প্রাচীরটা যখন একটু একঘেয়ে বোধ হচ্ছে এমন সময় হঠাৎ পাহাড় গেল দূরে সরে। পূর্ব বাংলার শীতের নদীর পরিচিত রূপটি ফুটে উঠল। এখানে ওখানে ছড়ানো চরের শুভ্র বালু কেটে কালো নীল জলের ধারা, দিকচক্রবালে গাছের ঘন সবুজ রেখা।

বেলা পড়ে আসছে; কেবিনের সামনে বেতের কুরসিতে রোদে বসে আছি। সম্মুখে একটা গোল চর, চারদিকে নীল পাহাড়; যারা ছিল নদীর পাশে, বাঁক ঘুরে মনে হচ্ছে তারা যেন নদীর মাঝ থেকে উঠেছে। একখণ্ড কালো মেঘ সূর্যকে আড়াল করেছে—রুপালি জরির পাড় দেওয়া নীলাম্বরীর আঁচল; মাঝখানে একটা চোখ-ঝলসানো গোল ফুটো দিয়ে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে; নদীতে রঙের স্রোত। সব মিলে মনে হচ্ছে যেন *টার্নারের* একখানা ছবি।

একটা চরের ওপারে নদীর মধ্যে সূর্য অস্ত গেল; আগুনের প্রকাণ্ড গ্লোব। ঘড়িতে পাঁচটা ছ-মিনিট। অনেকটা পুবে চলে এসেছি। শুক্রবার দিন সূর্যাস্তের সময় ঘড়িতে ছিল পাঁচটা পনেরো মিনিট। তবে আমার এ হাতঘড়িকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তি করা চলে না। ওর তিন দিনের গতিবিধির ফল অনেক সময় চমকপ্রদ।

স্তব্ধ ব্রহ্মপুত্রের বুকের উপর সন্ধ্যা নেমে এল। পুবে প্রতিপদের সোনালি চাঁদ, পশ্চিম-আকাশে বৃহস্পতি জ্বলজ্বল করছে।

জোসেফ ম্যালর্ড উইলিয়ম টার্নার (১৭৭৫ — ১৮৫১) : পৃথিবী বিখ্যাত ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী। জলরং ও তেলরঙে নিসর্গচিত্র আঁকার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর আঁকা ইংল্যান্ডের নদী ও সমুদ্রের ছবির সঙ্গে লেখক পূর্ববঙ্গে নদীবক্ষে ভ্রমণকালে দেখা নিসর্গদৃশ্যের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন।

দূরের পাল্লা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ছিপ্‌খান্ তিন্-দাঁড়—
তিনজন্ মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
দ্যায় দূর-পাল্লা।

পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল, — জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পান্নার টাঁকশাল।

কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ চর জাগ্‌ছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাক্‌ছে।

চুপ চুপ— ওই ডুব
দ্যায় পান্‌কৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোম্‌টার বউটি।

ঝক্‌ঝক্ কলসির
বক্‌বক্ শোন্ গো,
ঘোম্‌টায় ফাঁক রয়
মন উন্মন্ গো।

তিন দাঁড় ছিপ্‌খান্
মন্থর যাচ্ছে,
তিন জন মাল্লায়
কোন্ গান গাচ্ছে?

(অংশ)

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২) : জন্মস্থান বর্ধমান জেলার চুপি গ্রাম। পিতা রজনীনাথ দত্ত এবং মাতামহ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত। রবীন্দ্র সমকালীন কবিদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় কবি। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো — *সবিতা, সন্ধিক্ষণ, বেণু ও বীণা, ফুলের ফসল, কুহু ও কেকা, বেলাশেষের গান, বিদায় আরতি* প্রভৃতি এবং অনুবাদ কবিতা — *তীর্থসলিল, তীর্থরেণু, মণিমঞ্জুষা* প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যের জগতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ *ছন্দের জাদুকর* নামে পরিচিত। *নবকুমার কবিরত্ন* ছদ্মনামে তিনি বেশ কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেছেন। পাঠ্য কবিতাটি তাঁর *বিদায় আরতি* নামক কবিতার বই থেকে নেওয়া।

১. কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কাব্যজগতে কোন অভিধায় অভিহিত?

২. তাঁর লেখা দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৩.১ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কী নামে পরিচিত?

৩.২ কবিতাংশে যে নৌকোটির কথা রয়েছে, তাতে কতজন মাঝি রয়েছেন?

৩.৩ বন-হাঁস কী করছে?

৩.৪ নদীজলে কাদের ডুব দিতে দেখা যাচ্ছে?

৩.৫ মাঝিরা কেমনভাবে নৌকো বেয়ে চলেছে?

৪. ‘চৌপর’ শব্দের অর্থ সমস্ত দিন বা রাত। কবিতাংশে দিনের নানা ছবি কীভাবে পড়েছে তা লেখো।

৫. ‘পাল্লা’ শব্দটিকে পৃথক অর্থে ব্যবহার করে দুটি স্বাধীন বাক্য রচনা করো।

৬. ‘দাঁড়’ শব্দটি কবিতায় কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? শব্দটিকে পৃথক অর্থে ব্যবহার করে একটি বাক্য রচনা করো।

৭. ‘দিন-ভোর’ শব্দবন্ধের অর্থ সমস্ত দিন। সারাদিনের কাজ বোঝাতে তুমি আর কোন শব্দ ব্যবহার করতে পারো?

৮. ‘ঝোপঝাড়’ - এর মতো সমার্থক/প্রায় সমার্থক শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে পাঁচটি নতুন শব্দ তৈরি করো।

৯. ‘পান্না’ ও ‘চর’ শব্দদুটিকে দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহার করে দুটি স্বাধীন বাক্য রচনা করো।

১০. ‘টুপ্‌টুপ্‌’ ‘ঝক্‌ঝক্‌’ , ‘বক্‌বক্‌’ এর মতো ধ্বন্যাত্মক / অনুকার শব্দদ্বৈতের পাঁচটি উদাহরণ দাও।

বাঘাযতীন

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দস্যি ছেলে জ্যোতি সারাদিন অপেক্ষা করে—কখন দিনের শেষে মা তাকে নিয়ে যাবেন গড়ুই নদীতে স্নান করতে। কী শীত, কী বর্ষা, মায়ের ভ্রূক্ষেপ নেই। শাড়ির একমুড়ো জ্যোতির কোমরে বেঁধে অন্য মুড়োটা বজ্রমুষ্টিতে ধরে শিবরাত্রির সলতে এই একমাত্র ছেলেকে তিনি ছুড়ে ফেলে দেন জোয়ারের জলে। ঢেউগুলো ফণা মেরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর আপ্রাণ লড়তে লড়তে জ্যোতি যখন প্রায় অবসন্ন হব হব, সুপটু সাঁতারুর মতো মা তিরের বেগে এগিয়ে গিয়ে ছেলেকে তুলে নিয়ে যান।

এইভাবে জ্যোতি শেখে বিপদকে তুচ্ছ করতে।

রাতের বেলায় দিদি বিনোদবালার সঙ্গে শান্ত জ্যোতি মায়ের কোল জুড়িয়ে শোয় আর শোনে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের গল্প, রাণাপ্রতাপ, শিবাজি, সীতারাম রায়, প্রতাপাদিত্যের কাহিনি। বীরত্বের এসব কাহিনি শুনে বুকটা যেন তার টনটন করে। তেমনি প্রহ্লাদের গল্পে, চৈতন্য, নানক, কবীরের

কথায় মন ভ'রে ওঠে তার ভক্তিতে। ভীষণ তার রাগ আর দুঃখ হয় ইংরেজদের হাতে দেশের লোক কীভাবে কষ্ট পাচ্ছে, সে বৃত্তান্ত শুনে।

'আমি কিন্তু, মা, বড়ো হয়ে এদের সবার দুঃখ ঘুচিয়ে দেব,' বলতে বলতে ঘুমের দেশে চলে যায় জ্যোতি।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই মামাদের সঙ্গে জ্যোতি যায় কুস্তির আখড়ায়। গট্টিয়া গ্রাম থেকে যাদুমাল ওস্তাদ এসে তালিম দেয়। দেখতে দেখতে খাসা তাগড়া চেহারা হলো জ্যোতির।

ন-মামা অনাথের ছিল নানারকম কসরতের অভ্যাস। আর ঘোড়ায় চড়া, শিকার, দৌড়-ঝাঁপ প্রভৃতিতে তাঁর ভারি দখল। জ্যোতি এসব দিক থেকে তাঁর প্রিয় শাগরেদ। মামার সাদা ঘোড়া 'সুন্দরী'র পিঠে সওয়ার হয়ে প্রায়ই উধাও হয়ে যায় জ্যোতি।

মাঝে মাঝে শিলাইদহ থেকে কবি রবি ঠাকুরের ভাইপো সুরেন ঘোড়াটা ধার নিতে এসেই মামা আছেন অথচ ঘোড়া নেই দেখে হাসিমুখে প্রশ্ন করতেন : 'জ্যোতি বুঝি বেড়াতে গেছে?'

জ্যোতি ঘোড়া চড়তে অত ভালোবাসে দেখে মামা একটা টাট্টু ঘোড়া কিনে দিলেন তাকে। লাগাম ছাড়াই তার পিঠে চেপে ন-বছরের জ্যোতি গ্রামের কাদামাঠ পার হয়ে যায় সাতারার দুর্গের স্বপ্নে বিভোর হয়ে।

এমন সময়ে বড়োমামার সঙ্গে এল একদিন ফেরাজ খাঁ—চাটুজ্যে-বাড়ির পাহারাদার হয়ে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ফেরাজের বাড়ি। লাঠি, ছোরা, তরোয়াল, বন্দুক চালাতে অতি দক্ষ সে। ফেরাজের জন্য বড়োমামা আলাদা একটা ঘর দিলেন চণ্ডীমণ্ডপের ওধারে। আর তার হাতে দিলেন বাড়ির ছেলেদের খেলাধুলো শিক্ষার ভার।

কেউ কেউ বলেন যে এই আফ্রিদি ফেরাজ-কে দেখেই রবি ঠাকুর প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে কয়ার চাটুজ্যেবাড়ির তিন-চার পুরুষের সম্পর্ক। বড়োমামা বসন্তকুমারের মক্কেল ও বন্ধু ছিলেন রবি ঠাকুর।

ফেরাজের কাছে জ্যোতি খবর পেল যে শত অত্যাচারেও তার মুলুকের কেউ ইংরেজকে মেনে নেয়নি রাজা বলে। তারা প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে তাদের স্বাধীনতাকে। এই স্বাধীনতার জন্য মরতে তারা ডরে না, মারতে তারা পিছপা নয়।

গ্রামের পাঠ এবার শেষ হলো জ্যোতির।

বড়োমামা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ভরতি করালেন কৃষ্ণনগরের অ্যাংলো ভার্নাকুলার হাইস্কুলে। ওখানেই বড়োমামা ওকালতি করেন তখন।

পড়াশোনায় জ্যোতির মাথা খুব সাফ। দুষ্টু বুদ্ধিতেও সে দড়। কদিনের মধ্যেই ইস্কুলের দামালদের সে পাণ্ডা হয়ে উঠল। কিন্তু তার দুষ্টুমির মধ্যে নেই বিন্দুমাত্র শয়তানির ছোঁয়া।

ইস্কুলের বাগানে বড়ো কাঁঠাল পেকেছে। গন্ধে মেতে উঠছে সবার মন। যথেষ্ট ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সহপাঠীদের কারো সাহস হচ্ছে না এক-আধটা কাঁঠাল পেড়ে খাবার। তাই দেখে জ্যোতির মগজে খেলে গেল নতুন একটা মতলব।

'অ্যাই, আজ ইস্কুল ভাঙলেই চলে যাস না; মজা করা যাবে সবাই মিলে,' চুপি চুপি সবার কানে কানে এই কথা সে রটিয়ে দিল।

স্কুল ভাঙল।

বন্ধুদের দু-তিনজনকে নিয়ে বেশ কয়েকটা পাকা পাকা কাঁঠাল পেড়ে মহা ফুর্তিতে ভোজ বসিয়ে দিল জ্যোতি।

পরদিন হেডমাস্টারের কাছে নালিশ গেল।

'কে কাঁঠাল চুরি করেছ?' ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে তিনি জানতে চাইলেন। কেউই অপরাধ স্বীকার করতে নারাজ। তাই দেখে জ্যোতি কবুল করল — সে একাই কাঁঠাল পেড়েছে এবং বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছে। কিন্তু যেহেতু এগুলো তাদেরই ইস্কুলের গাছের ফল, সেজন্য ওগুলো পেড়ে খাওয়াকে চুরি বলে সে মানতে পারে না!

জ্যোতির সত্যকথা বলবার সাহস আর তার যুক্তির ধরন দেখে হেডমাস্টার হাসি চেপে ধমক দিলেন: 'আর এমন কোরো না।'

সবাই রেহাই পেল।

উপরন্তু পরের বছর গাছের কাঁঠাল পাকতেই নিজে থেকে হেডমাস্টারমশাই মালি দিয়ে ভালো ভালো কাঁঠাল পাড়িয়ে ছেলেদের পিকনিক লাগিয়ে দিলেন।

১৮৯৩ সালে ঘটল একটা ঘটনা। জ্যোতির বয়স তখন চোদ্দো।

কৃষ্ণনগরের বাজারে সে গিয়েছে কাগজ-পেনসিল কিনতে। নদিয়া ট্রেডিং কোম্পানির এক দোকানে সে দাম মিটিয়ে দিচ্ছে, এমন সময় তার কানে এল — এক দারুণ হই-হল্লা।

দোকান থেকে জ্যোতির চোখ পড়ল — পথচারী সবাই ছুটে পালাচ্ছে। একটা পাগলা ঘোড়া বেরিয়েছে রাস্তায়।

অদূরে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মাঝপথে দাঁড়িয়ে কাঁদছে এক শিশু।

জ্যোতি মনস্থির করে ফেলল।

একলাফে রাস্তায় নেমে শিশুটি আর ঘোড়ার মাঝামাঝি যেতে না যেতেই ঘোড়া এসে পড়ল প্রায় তার ঘাড়ের কাছে। তিরবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে জ্যোতি চেপে ধরল ঘোড়ার কেশর। আচমকা বাধা পেয়ে শিষ-পা হয়ে ঘোড়টা জ্যোতিকে ফেলে দিতে চেষ্টা করল কয়েকটা ঝটকা দিয়ে।

জ্যোতি ততক্ষণে উঠে বসেছে ঘোড়ার পিঠে।

অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিতে ঘোড়ার পিঠে গলায় দাবনায় ছোটো ছোটো চাপড় মেরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো থমকে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটা উপভোগ করতে লাগল জ্যোতির আদর। থেকে থেকে কাঁপুনি জাগল তার সারা গায়ে।

এমন সময় ঘোড়ার সহিস বেরিয়ে এল ভিড় ঠেলে; স্থানীয় উকিল বারাণসী রায়ের আস্তাবল থেকে ঘোড়াটা পালিয়ে এসেছে। সহিসের হাত থেকে লাগাম নিয়ে ঘোড়ার গলায় পরিয়ে দিয়ে জ্যোতি যেই নেমে এল — ধন্য ধন্য পড়ল চারিদিকে।

কিছুই হয়নি এমনভাবে জ্যোতি চলে গেল তার নিজের পথে।

সারা দেশে সেদিন ছড়িয়ে পড়ল কৃষ্ণনগরের এই কাহিনি। মহা গর্বে বড়োমামা বসন্তকুমার লোক পাঠিয়ে খবর দিলেন শরৎশশীকে।

উৎসবে-পার্বণে বড়োমামার সঙ্গে জ্যোতিও গ্রামে ফেরে। পড়াশোনা নির্দোষ দুষ্টুমি ছাড়াও তার একটা নেশা ছিল। লালন ফকিরের শিষ্য অন্ধ বাউল পাঁচু ফকিরের আখড়ায় গিয়ে তন্ময় হয়ে সে শোনে বাউলের গান।

জ্যোতির আরও দুটো নেশার মধ্যে ছিল ফুটবল খেলা আর যাত্রা কিংবা শখের থিয়েটারে অভিনয় করা। বাড়িতে পালা-পার্বণে সবাই মিলে প্রায়ই নাটক করে; জ্যোতি, তার ছোটোমামা ললিত, বন্ধু ভবভূষণ মিত্র, কুঞ্জলাল সাহা, আরও অনেকে।

জ্যোতির সবচেয়ে প্রিয় ভূমিকা ছিল — ভক্ত হনুমান, লক্ষ্মণ, রাজা হরিশচন্দ্র , বীর প্রতাপাদিত্য ! ... বহুবার তাকে দেখা গিয়েছে বড়োমামার পাগড়ি চুরি করে বানিয়েছে হনুমানের লেজ।

দুর্গোৎসবের চার দিন মামাবাড়িতে নিত্য রাঁধা হতো আজকের হিসাবে প্রায় চারশো কিলোগ্রাম ওজনের চালের ভাত। এই ভাত রাঁধতেও জ্যোতি ও তার সাঙ্গোপাঙ্গের উৎসাহ অপরিসীম। প্রসাদ পেতে আহূত - রবাহূত কম লোকের সমাগম হতো না চাটুজ্যে-বাড়িতে।

ভদ্রলোকদের জন্য রেওয়াজ ছিল সাদা ভাত আর অন্যান্য প্রজাদের জন্য ঘরের লাল চালের ভাত পরিবেশনের।

একদিন এক জেলে প্রজা কিন্তু কিন্তু করে একটু সাদা ভাত চেখে দেখতে চাইল। শুনে জ্যোতির বড়ো মায়া হলো। ছোটোমামার সঙ্গে গিয়ে সে বসন্তকুমারকে ধরল — পরদিন থেকে সবার জন্যই এল সাদা ভাত।

নবমীর দিনে প্রজারা নানারকম বল-পরীক্ষা খেলা দিয়ে সবাইকে আনন্দ দেয়। তাদের ভিড়ের মধ্যে প্রায়ই হুট করে এসে হাজির হয় জ্যোতিবাবু; একটা নারকোল বুকে নিয়ে উপুড় হয়ে সে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে— আট-দশটা সাজোয়ান প্রজা মিলেও তার কাছ থেকে ফলটা কেড়ে নিতে পারে না।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে জ্যোতি ও তার ছোটোমামার ব্যবস্থায় জাতি-বর্ণ ভুলে গ্রামের সবাই বসলেন একসঙ্গে পঙ্‌ক্তি-ভোজনে : হিন্দু, মুসলমান, বামুন, চাঁড়াল সবাই খেলেন মহাতৃপ্তিতে মায়ের প্রসাদ।

হা তে ক ল মে

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৩৬ —) : বাঘাযতীনের পৌত্র পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ আশ্রম থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল সমাজ ও ইতিহাসের গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন। *পুরোধা* নামক কিশোর পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। গবেষণা ও সাংবাদিকতা সূত্রে বহুদিন বিদেশে ছিলেন। তিনি বাঘাযতীন বিষয়ক একাধিক বইয়ের লেখক। তাঁর অনান্য আরো কয়েকটি বই হলো *সমসাময়িকের চোখে শ্রী অরবিন্দ, আলোর চকোর* প্রভৃতি।

১. পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কার পৌত্র?

২. তাঁর লেখা একটি বইয়ের নাম লেখো।

৩. **শিলাইদা শব্দটি এসেছে 'শিলাইদহ' থেকে। অর্থাৎ 'দহ' পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে 'দা'। নীচের নামগুলি পরিবর্তিত হয়ে কী হবে লেখো :**

শিয়ালদহ = ______ **বেলদহ** = ______ **খড়দহ** = ______

এরকম কয়টি শব্দ তুমি জানো লেখো।

৪. **জ্যোতিকে মা যে যে গল্প শোনান —**

২.১ ______ ২.২ ______

২.৩ ______ ২.৪ ______

শব্দার্থ : মুড়ো — মাথা। বজ্রমুষ্টি — শক্ত মুঠি। শিবরাত্রির সলতে — একমাত্র অবলম্বন। বৃত্তান্ত — বিবরণ। তালিম — শিক্ষা, অনুশীলন। খাসা — চমৎকার। তাগড়া — বলিষ্ঠ। কসরত — কৌশল, কায়দা। শাগরেদ — শিষ্য। সওয়ার — আরোহী। শিলাইদা — 'শিলাইদহ'- র কথ্য রূপ, বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ স্থান, এক কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। টাট্টু ঘোড়া — ছোটো ঘোড়াবিশেষ। বিভোর — মুগ্ধ, আত্মহারা। মুলুক — দেশ। পিছপা — পিছিয়ে যাওয়া। ডরে না — ভয় করে না। দামাল — দুষ্টু। হুট করে — হঠাৎ করে। সাজোয়ান প্রজা — এখানে 'পালোয়ান' অর্থে ব্যবহৃত। পঙ্‌ক্তিভোজন — একসারিতে বসে খাওয়া। চাঁড়াল — চণ্ডাল শব্দের কথ্যরূপ।

৫. **নীচের দুটি স্তম্ভের শব্দ গুলিকে বিপরীত শব্দ অনুযায়ী মেলাও :**

ক	খ
শেষ	রাত্রি
দিবস	অনপেক্ষা
অপেক্ষা	অশান্ত
জোয়ার	শুরু
শান্ত	পরাধীনতা
দু:খ	সুখ
স্বাধীনতা	ভাটা

৬. জ্যোতি যে যে চরিত্রে অভিনয় করতে ভালোবাসে সেগুলির নাম লেখো ।

৭. গল্পটি পড়ে জ্যোতির যে কাজগুলিকে দু:সাহসিক বলে মনে হয়েছে সেগুলি বর্ণনা করো।

৮. স্কুলের বাগানে বড়ো কাঁঠাল পেকেছে। এখানে 'পাকা' ক্রিয়াপদটি যে-অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেই অর্থ ছাড়া তোমরা আর কী কী অর্থে ব্যবহার করতে পারো লেখো :

যেমন— গ্রামে অনেক পাকা বাড়ি আছে।

৯. **কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়াগুলিকে তাদের ঘরে বসাও :**

৯.১ একটি টাট্টু ঘোড়া কিনে দিলেন মামা।

৯.২ যাদুমালা ওস্তাদ কুস্তি শেখায়।

৯.৩ মা সাঁতার শেখাতেন।

৯.৪ জ্যোতি বাউল গান শোনে।

১০. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

১০.১ জ্যোতির মায়ের নাম কী?

১০.২ মা জ্যোতিকে কোন নদীতে স্নান করাতে নিয়ে যেতেন?

১০.৩ রবি ঠাকুরের ভাইপো কে?

১০.৪ জ্যোতির ন' মামার নাম কী?

১০.৫ ফেরাজ খাঁ-এর বাড়ি কোথায় ছিল?

১০.৬ জ্যোতির বড়োমামার পেশা কী ছিল?

১০.৭ জ্যোতি কোন স্কুলে ভরতি হয়েছিল?

১০.৮ ১৮৯৩ সালে জ্যোতির বয়স ছিল ১৪। কত সালে জ্যোতির ৭ বছর বয়স ছিল?

১১. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১১.১ জ্যোতি কীভাবে সাঁতার শিখেছিল?

১১.২ কৃষ্ণনগর স্কুলে জ্যোতির কাঁঠাল পাড়ার কাহিনিটি বর্ণনা করো।

১১.৩ কৃষ্ণনগরে জ্যোতি কীভাবে একটি শিশুকে বাঁচিয়েছিল সেই কাহিনিটি লেখো।

১১.৪ জ্যোতির জীবনে তাঁর মা ও দিদির ভূমিকার কথা লেখো।

১১.৫ পাঠ্যাংশে জ্যোতির জীবনে তাঁর মামাদের প্রভাব কেমন ছিল?

১১.৬ জ্যোতির মামাবাড়ির সঙ্গে রবিঠাকুরের সম্পর্ক কী ছিল?

১১.৭ 'ফেরাজের কাছে জ্যোতি খবর পেল'—কে এই ফেরাজ? তাঁর কাছ থেকে জ্যোতি কী খবর পেল?

১১.৮ পাঠ্যাংশ থেকে খুঁজে নিয়ে জ্যোতির শিশুসুলভ/কিশোরসুলভ চাপল্যের উদাহরণ দাও।

১১.৯ 'কিছুই হয়নি এমনভাবে জ্যোতি চলে গেল তার নিজের পথে' — কোন ঘটনার পর জ্যোতি এমনভাবে চলে গিয়েছিল?

১১.১০ জাতপাতের ক্ষুদ্র সংকীর্ণতা ছোটোবয়েসেই কীভাবে জ্যোতি অতিক্রম করতে পেরেছিল?

১১.১১ পাঠ্যাংশে জ্যোতির নানা ধরনের কাজের যে পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে, তা নিয়ে তুমি নিজের ভাষায় একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো।

জেনে রাখো :

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঘাযতীন (১৮৭৯-১৯১৫) জন্ম মাতুলালয়ে। অধুনা বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়ার কাছে কয়া গ্রামে। পিতৃনিবাস যশোহরের রিশখালি গ্রামে। পিতা উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মা শরৎশশী দেবী। তাঁরা আলোচনা করে সন্তানের নাম রাখেন 'জ্যোতি', যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ছোটোবেলা থেকেই অসমসাহসী যতীন্দ্রনাথকে 'বাঘাযতীন' নামটি দিয়েছিলেন তাঁর গুরুদেব তাঁকে বলেছিলেন 'শূরবীর—শের কা বাচ্চা'। পাঠ্যাংশে সেই বীরবিপ্লবী বাঘাযতীনের শৈশব আর কৈশোরের কথা শুনিয়েছেন তাঁরই পৌত্র পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্ভবত সে কারণেই পারিবারিক সূত্রে আদর করে পাওয়া ছোটোবেলার 'জ্যোতি' নামটিই লেখক তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছেন।

আদর্শ ছেলে

কুসুমকুমারী দাশ

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে?
কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হবে;
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
'মানুষ' হইতে হবে,—এই তার পণ।

বিপদ আসিলে কাছে, হও আগুয়ান,
নাই কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ?
হাত, পা সবারই আছে, মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয়?

সে ছেলে কে চায় বলো?—কথায় কথায়,
আসে যার চোখে জল, মাথা ঘুরে যায়।
সাদা প্রাণে হাসি মুখে করো এই পণ—
'মানুষ' হইতে হবে, মানুষ যখন।

কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার,
সবারই রয়েছে কাজ, এ বিশ্বমাঝার,
হাতে প্রাণে, খাটো সবে, শক্তি করো দান,
তোমরা 'মানুষ' হলে, দেশের কল্যাণ।

হাতেকলমে

কুসুমকুমারী দাশ (১৮৭৫—১৯৪৮) : কবি জীবনানন্দ দাশের মা। তিনি নিজেও সেই সময়ের বিশিষ্ট মহিলা কবি ও সুলেখিকা। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম *কবিতা মুকুল*। এছাড়া *পৌরাণিক আখ্যায়িকা* নামক একটি গদ্যগ্রন্থও তিনি রচনা করেন। *প্রবাসী, ব্রহ্মবাদী, মুকুল* প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর রচিত অসংখ্য কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা কবিতার ভাষা সরল এবং ভাব সহজ তাই সাধারণ পাঠক তা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে।

১. কুসুমকুমারী দাশের কবিতা কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হতো?

২. তাঁর রচিত একটি গদ্য গ্রন্থের নাম লেখো।

৩. **নীচের শব্দগুলির বর্ণ-বিশ্লেষণ করো। একটি ছক করে তার ঠিক ঠিক ঘরে হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর এবং বর্গীয় বর্ণগুলিকে বসাও:**

আমাদের, আগুয়ান, প্রাণ, কৃষক, বিশ্বমাঝার, কল্যাণ।

৪. এই কবিতায় মানুষের যে যে অঙ্গের নাম পেয়েছ সেগুলি বের করে প্রতিটির তিনটে করে সমার্থক শব্দ লেখো।

৫. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৫.১ নাই কি ____ তব রক্ত, মাংস, প্রাণ?

৫.২ ____ রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয়?

৫.৩ আসে যার চোখে জল, ____ ঘুরে যায়।

৫.৪ কৃষকের শিশু কিংবা ____ ।

৫.৫ মুখে হাসি, বুকে ____, তেজে ভরা মন।

৬. **কবিতার পঙক্তিগুলিকে গদ্যরূপে লেখো :**

৬.১ বিপদ আসিলে কাছে, হও আগুয়ান।

৬.২ আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে?

৬.৩ সবারি রয়েছে কাজ, এ বিশ্বমাঝার।

৬.৪ ‘মানুষ’ হইতে হবে, মানুষ যখন।

৬.৫ নাই কী শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ?

৭. **নীচের শব্দগুলিতে কোন কোন অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, ঘোষ ও অঘোষ বর্ণ আছে লেখো :**

কথা, মুখ, প্রাণ, মানুষ, দান, চোখ।

৮. **নীচের বাক্যগুলির কর্তা/ক্রিয়া/কর্ম চিহ্নিত করে লেখো :**

৮.১ আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে ?

৮.২ 'মানুষ' হইতে হবে, - এই তার পণ।

৮.৩ সে ছেলে কে চায় বলো ?

৮.৪ সবারই রয়েছে কাজ, এ বিশ্বমাঝার।

৮.৫ তোমরা 'মানুষ' হলে, দেশের কল্যাণ।

কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া

৯. **নীচের বাক্য/বাক্যাংশগুলির থেকে সর্বনাম খুঁজে নিয়ে তা দিয়ে আলাদা বাক্য রচনা করো :**

৯.১ নাই কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ ?

৯.২ চেতন রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয় ?

৯.৩ আসে যার চোখে জল।

৯.৪ সে ছেলে কে চায় বলো ?

৯.৫ তোমরা মানুষ হলে দেশের কল্যাণ।

১০. **পাশের শব্দগুলির আগে বিশেষণ জুড়ে তা দিয়ে বাক্যরচনা করো :** ছেলে, বিপদ, প্রাণ, কৃষক, শক্তি, দেশ।

শব্দার্থ : বল — শক্তি। পণ — প্রতিজ্ঞা। আগুয়ান — এগিয়ে যাওয়া। কল্যাণ — মঙ্গল।

১১. **নীচের পঙ্‌ক্তিগুলিতে 'কি'-র ব্যবহার লক্ষ করো।**

- 'নাই কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ ?'
- 'চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয় ?'

১১.১ এবার তুমি 'কি' ব্যবহার করে আরো দুটি বাক্য লেখো :

____

____

১১.২ বাক্যে 'কী'-র ব্যবহার কখন হয় তা-ও জেনে নিয়ে আরো দুটি বাক্য লেখো :

____

____

১২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১২.১ ‘কথায় না বড়ো হয়ে কাজে বড়ো হবে’— বলতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

১২.২ ‘চেতনা রয়েছে যার সে কি পড়ে রয়?’— চেতনাসম্পন্ন মানুষ কী ধরনের কাজে এগিয়ে যায়?

১২.৩ ‘সবারই রয়েছে কাজ এ বিশ্বমাঝার।’— তুমি বড়ো হয়ে কোন কাজ করতে চাও? কেনই বা তুমি সে কাজ করতে চাও লেখো।

১২.৪ ‘আদর্শ ছেলে’ কবিতায় কবি আমাদের দেশের ছেলেদের কাছে কী প্রত্যাশা করেন?

১২.৫ প্রত্যেক দেশবাসীর কী প্রতিজ্ঞা করা উচিত?

১২.৬ দেশের জন্য অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে দেশকে স্বাধীন করেছেন, এমন কয়েকজনের নাম লেখো।

১২.৭ ‘আদর্শ ছেলে’-কে প্রধানত কোন কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে?

১২.৮ ‘আদর্শ ছেলে’ কবিতায় কবি যেমন ছেলেকে আমাদের দেশের জন্য চেয়েছেন, তেমন কোনো প্রিয় ‘ছেলে’-র সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লেখো।

উঠো গো ভারতলক্ষ্মী

অতুলপ্রসাদ সেন

উঠো গো ভারতলক্ষ্মী! উঠো আজি জগৎ-জন পূজ্যা!
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, করো দূরিত ভারত লজ্জা।
ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা, করো সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে।
জননী গো লহো তুলি বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলি চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।
কাণ্ডারী নাহিক কমলা! দুখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগরকম্পন-দর্শে,
তোমার অভয়-পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে ।
জননী গো লহো তুলি বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলি চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।
ভারত শ্মশান করো পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কূজিত-কুঞ্জে
দ্বেষ হিংসা করি চূর্ণ, করো পূরিত প্রেম অলি গুঞ্জে
দূরিত করি পাপপুঞ্জে, তপঃ ভুঞ্জে,
পুনঃ বিমল করো ভারত পুণ্যে।
জননী গো লহো তুলি বক্ষে,
সান্ত্বন-বাস দেহো তুলি চক্ষে;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো ।

অতুল প্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) : বিখ্যাত গীতিকার, সুরকার এবং গায়ক। লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী অতুলপ্রসাদ স্বাদেশিকতা, প্রেম ও ভক্তি বিষয়ক অজস্র গানের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন।

অষ্টম পাঠ

যতীনের জুতো

সুকুমার রায়

যতীনের নতুন জুতো কিনে এনে তার বাবা বললেন, ‘এবার যদি অমন করে জুতো নষ্ট করো তবে ওই ছেঁড়া জুতোই পরে থাকবে।’

যতীনের চটি লাগে প্রতিমাসে একজোড়া। ধুতি তার দু-দিন যেতে না যেতেই ছিঁড়ে যায়। কোনো জিনিসে তার যত্ন নেই। বইগুলো সব মলাট ছেঁড়া, কোণ দুমড়ানো, স্লেটটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ফাটা। স্লেটের পেনসিলগুলি সর্বদাই তার হাত থেকে পড়ে যায়, কাজেই ছোটো ছোটো টুকরো টুকরো। আরেকটা তার মন্দ অভ্যাস ছিল, লেড-পেনসিলের গোড়া চিবানো। চিবিয়ে চিবিয়ে তার পেনসিলের কাঠটা বাদামের খোলার মতো খেয়ে গিয়েছিল। তাই দেখে ক্লাসের মাস্টারমশাই বলতেন, ‘তুমি কি বাড়িতে ভাত খেতে পাও না?’

নতুন চটি পায়ে দিয়ে প্রথম দিন যতীন খুব সাবধানে রইল, পাছে ছিঁড়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামে, চৌকাঠ ডিঙোবার সময় সাবধানে থাকে, যাতে না ঠোক্কর খায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই। দু-দিন

পরে আবার যেই সেই। চটির মায়া ছেড়ে দুড়দুড় করে সিঁড়ি নামা, যেতে যেতে দশবার হোঁচট খাওয়া, সব আরম্ভ হলো। কাজেই এক মাস যেতে না যেতে চটির একটা পাশ একটু হাঁ করল। মা বললেন, 'ওরে, এই বেলা মুচি ডেকে সেলাই করা, না হলে একেবারে যাবে।' কিন্তু মুচি আর ডাকা হয় না। চটির হাঁ-ও বেড়ে চলে।

একটি জিনিসের যতীন খুব যত্ন করত। সেটি হচ্ছে তার ঘুড়ি। যে ঘুড়িটি তার মনে লাগত সেটিকে সে সযত্নে জোড়াতাড়া দিয়ে যতদিন সম্ভব টিকিয়ে রাখত। খেলার সময়টা সে প্রায় ঘুড়ি উড়িয়েই কাটিয়ে দিত। এই ঘুড়ির জন্য কত সময়ে তাকে তাড়া খেতে হতো। ঘুড়ি ছিঁড়ে গেলে সে রান্নাঘরে গিয়ে উৎপাত করত তার আঠা চাই বলে। ঘুড়ির লেজ লাগাতে কিংবা সুতো কাটতে কাঁচি দরকার হলে সে মায়ের সেলাইয়ের বাক্স ঘেঁটে ঘন্ট করে রেখে দিত। ঘুড়ি উড়াতে আরম্ভ করলে তার খাওয়াদাওয়া মনে থাকত না। সেদিন যতীন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছে ভয়ে ভয়ে। গাছে চড়তে গিয়ে তার নতুন কাপড়খানা অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। বই রেখে চটি পায়ে দিতে গিয়ে দেখে, চটিটা এত ছিঁড়ে গেছে যে আর পরাই মুশকিল। কিন্তু সিঁড়ি নামবার সময় তার সে কথা মনে রইল না, সে দু-তিন সিঁড়ি ডিঙিয়ে নামতে লাগল। শেষে তাতে চটির হাঁ বেড়ে বেড়ে সমস্ত দাঁত বের করে ভেংচাতে লাগল। যেমনি সে শেষ তিনটা সিঁড়ি ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়েছে, অমনি মাটিটা তার পায়ের নীচ থেকে সুড়ুৎ করে সরে গেল, আর ছেঁড়া চটি তাকে নিয়ে সাঁইসাঁই করে শূন্যের উপর দিয়ে কোথায় যে ছুটে চলল তার ঠিকঠিকানা নেই।

ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে চটি যখন থামল, তখন যতীন দেখল সে কোন অচেনা দেশে এসে পড়েছে। সেখানে চারদিকে অনেক মুচি বসে আছে। তারা যতীনকে দেখে কাছে এল, তারপর তার পা থেকে ছেঁড়া চটিজোড়া খুলে নিয়ে সেগুলোকে যত্ন করে ঝাড়তে লাগল। তাদের মধ্যে একজন মাতব্বর গোছের, সে যতীনকে বলল, 'তুমি দেখছি ভারি দুষ্ট। জুতোজোড়ার এমন দশা করেছ? দেখো দেখি, আর একটু হলে বেচারিদের প্রাণ বেরিয়ে যেত!' যতীনের ততক্ষণে একটু সাহস হয়েছে। সে বলল, 'জুতোর আবার প্রাণ থাকে নাকি?' মুচিরা বলল, 'তা না তো কি? তোমরা বুঝি মনে করো, তোমরা যখন জুতো পায়ে দিয়ে জোরে জোরে হাঁটো তখন ওদের লাগে না? খুব লাগে। লাগে বলেই তো ওরা

মচ্‌মচ্‌ করে। যখন তুমি চটি পায়ে দিয়ে দুড়্‌দুড়্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করেছিলে আর তোমার পায়ের চাপে ওর পাশ কেটে গিয়েছিল, তখন কি ওর লাগেনি? খুব লেগেছিল। সেইজন্যই ও তোমাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। যত রাজ্যের ছেলেদের জিনিসপত্রের ভার আমাদের উপর। তারা সে সবের অযত্ন করলে আমরা তাদের শিক্ষা দিই।' মুচি যতীনের হাতে ছেঁড়া চটি দিয়ে বলল, 'নাও, সেলাই করো।' যতীন রেগে বলল, 'আমি জুতো সেলাই করি না, মুচিরা করে।' মুচি একটু হেসে বল, 'একি তোমাদের দেশ পেয়েছ যে করব না বললেই হলো? এই ছুঁচ সুতো নাও, সেলাই করো।' যতীনের রাগ তখন কমে এসেছে, তার মনে ভয় হয়েছে। সে বলল, 'আমি জুতো সেলাই করতে জানি না।' মুচি বলল, 'আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, সেলাই তোমাকে করতেই হবে।' যতীন ভয়ে ভয়ে জুতো সেলাই করতে বসল। তার হাতে ছুঁচ ফুটে গেল, ঘাড় নীচু করে থেকে থেকে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল, অনেক কষ্টে সারাদিনে একপাটি চটি সেলাই হল। তখন সে মুচিকে বলল, 'কাল অন্যটা করব। এখন খিদে পেয়েছে।' মুচি বলল, 'সে কী! সব কাজ শেষ না করে তুমি খেতেও পাবে না, ঘুমোতেও পাবে না। একপাটি চটি এখনও বাকি আছে। তারপর তোমাকে আস্তে আস্তে চলতে শিখতে হবে, যেন আর কোনো জুতোর উপর অত্যাচার না কর। তারপর দরজির কাছে গিয়ে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করতে হবে। তারপর আরো কী কী জিনিস নষ্ট করেছ দেখা যাবে।'

যতীনের তখন চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে। সে কাঁদতে কাঁদতে কোনো রকমে অন্য চটিটা সেলাই করল। ভাগ্যে এ পাটি বেশি ছেঁড়া ছিল না। তখন মুচিরা তাকে একটা পাঁচতলা উঁচু বাড়ির কাছে নিয়ে গেল। সে বাড়িতে একটা সিঁড়ি বরাবর একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গেছে। তারা যতীনকে সেই সিঁড়ির নীচে দাঁড় করিয়ে দিয়ে

বলল, 'যাও, একেবারে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে যাও, আবার নেমে এসো। দেখো, আস্তে আস্তে একটি একটি সিঁড়ি করে উঠবে নামবে।' যতীন পাঁচতলা পর্যন্ত উঠে গিয়ে নেমে এল। সে নীচে আসলে মুচিরা বলল, 'হয়নি। তুমি তিনবার দুটো সিঁড়ি এক সঙ্গে উঠেছ, পাঁচবার লাফিয়েছ, দুবার তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়েছ। আবার ওঠো। মনে থাকে যেন, একটুও লাফাবে না, একটাও সিঁড়ি ডিঙোবে না।' এতটা সিঁড়ি উঠে নেমে যতীন বেচারীর পা টনটন করছিল। সে এবার আস্তে আস্তে উপরে উঠল, আস্তে আস্তে নেমে এল। তারা বলল, 'আচ্ছা এবার মন্দ হয়নি। তাহলে চলো দরজির কাছে।'

এই বলে তারা তাকে আর একটা মাঠে নিয়ে গেল সেখানে খালি দরজিরা বসে সেলাই করছে। যতীনকে দেখেই তারা কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী ? কী ছিঁড়েছ ?' মুচিরা উত্তর দিল, 'নতুন ধুতিটা দেখ কতটা ছিঁড়ে ফেলেছে।' দরজিরা মাথা নেড়ে ডেকে বলল, 'বড়ো অন্যায়, বড়ো অন্যায় ! শিগগির সেলাই করে।' যতীনের আর 'না' বলবার সাহস হলো না। সে ছুঁচ-সুতো নিয়ে ছেঁড়া কাপড় জুড়তে বসে গেল। সবেমাত্র দু-এক ফোঁড় দিয়েছে অমনি দরজিরা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওকে কি সেলাই বলে ? খোলো, খোলো !' অমনি করে, বেচারি যতবার সেলাই করে, ততবার তারা বলে, 'খোলো, খোলো !' শেষে সে একেবারে কেঁদে ফেলল, বলল, 'আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও, আমি আর কক্ষনো কাপড় ছিঁড়ব না, ছাতা ছিঁড়ব না।' তাতে দরজিরা হাসতে হাসতে বলল, 'খিদে পেয়েছে ? তা তোমার খাবার জিনিস তো আমাদের কাছে ঢের আছে।' এই বলে তারা তাদের কাপড়ে দাগ দেওয়ার পেনসিল কতগুলো এনে দিল। 'তুমি তো পেনসিল চিবোতে ভালোবাসো, এইগুলো চিবিয়ে খাও, আর কিছু আমাদের কাছে নেই।'

এই বলে তারা যার যার কাজে চলে গেল। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে যতীন কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে শুয়ে পড়ল। এমন সময় আকাশে বোঁ বোঁ করে কীসের শব্দ হলো, আর যতীনের তালি-দেওয়া সাধের ঘুড়িটা গোঁৎ খেয়ে এসে তার কোলের উপর পড়ল। ঘুড়িটা ফিসফিস করে বলল, 'তুমি আমাকে যত্ন করেছ, তাই আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি। শিগগির আমার লেজটা ধরো।' যতীন তাড়াতাড়ি ঘুড়ির লেজ ধরল। ঘুড়িটা অমনি তাকে নিয়ে সোঁ করে আকাশে উঠে গেল। সেই শব্দ শুনে দরজিরা বড়ো বড়ো কাঁচি নিয়ে ছুটে এল ঘুড়ির সুতোটা কেটে দিতে। হঠাৎ ঘুড়ি আর যতীন জড়াজড়ি করে নীচের দিকে পড়তে লাগল।

পড়তে পড়তে যেই মাটিটা ধাঁই করে যতীনের মাথায় লাগল, অমনি সে চমকে উঠল। ঘুড়িটার কী হলো কে জানে। যতীন দেখল সে সিঁড়ির নীচে শুয়ে আছে, আর তার মাথায় ভয়ানক বেদনা হয়েছে।

কিছু দিন ভুগে যতীন সেরে উঠল। তার মা বলতেন, 'আহা, সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে, এই ভোগান্তিতে বাছা আমার বড়ো দুর্বল হয়ে গেছে। সে স্ফূর্তি নেই, সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে চলা নেই, কিছুই নেই। তা নইলে এক জোড়া জুতো চার মাস যায় ?'

সুকুমার রায় (১৮৮৭—১৯২৩) : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র। শিশু সাহিত্যিক হিসেবে অসামান্য প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচিত বিভিন্ন বইয়ে। বাংলা শিশু সাহিত্যে তিনি নিজেই এক স্বতন্ত্র ঘরানা। হালকা হাসি ও রসিকতার মধ্যে দিয়ে কঠিন বাস্তবের ছবি এঁকেছেন তিনি। তাঁর রচনা সর্বকালের শিশুদের কাছে সমান জনপ্রিয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য বইগুলি হলো — *আবোল তাবোল, হ য ব র ল, পাগলা দাশু, অবাক জলপান, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, শব্দকল্পদ্রুম* ইত্যাদি। এছাড়া উপেন্দ্রকিশোরের মতোই আধুনিক বাংলা মুদ্রণশিল্পে তাঁরও বিশিষ্ট অবদান ছিল।

১. *আবোল তাবোল* বইটি কার লেখা?

২. তাঁর লেখা দুটি নাটকের নাম লেখো।

৩. **একটি বাক্যে উত্তর দাও:**

৩.১ নতুন জুতো কিনে এনে যতীনের বাবা তাকে কী বলেছিলেন?

৩.২ যতীনের স্লেট পেনসিলগুলো টুকরো টুকরো কেন?

৩.৩ যতীন কোন জিনিসটি যতদিন সম্ভব টিকিয়ে রাখত?

৩.৪ যতীন কখন রান্নাঘরে গিয়ে উৎপাত করত?

৩.৫ খেলার সময়টা সে কীভাবে কাটাতে ভালোবাসত?

৩.৬ যতীন কোথায় দরজিদের দেখা পেয়েছিল?

৩.৭ দরজিরা যতীনকে কী খেতে পরামর্শ দিয়েছিল?

৩.৮ অসহায় যতীনকে সাহায্যের জন্য শেষে কে এগিয়ে এসেছিল?

৪. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ যতীন শেষ তিনটে সিঁড়ি ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়ায় কী হয়েছিল?

৪.২ চটি যতীনকে মুচিদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল কেন?

৪.৩ 'মনে থাকে যেন, একটুও লাফাবে না, একটাও সিঁড়ি ডিঙাবে না'—কারা যতীনকে এই কথা বলেছিল? কখন বলেছিল?

৫. 'আহা সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে, এই ভোগানিতে বাছা আমার বড় দুর্বল হয়ে গেছে।' —যতীনের মায়ের এই ভাবনা যদি সত্যিও হয়, তবু যতীনের লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে না চলার কারণ তোমার যা মনে হয়—পাঁচটি বাক্যে লেখো।

৬. **কে কোন কথাটি বলেছে তা মিলিয়ে লেখো :**

বক্তা	কথা
১। ঘুড়ি	১। এবার যদি অমন করে জুতো নষ্ট করো তবে ওই ছেঁড়া জুতোই পরে থাকবে।
২। দরজি	২। তুমি কি বাড়িতে ভাত খেতে পাওনা?
৩। বাবা	৩। ওরে, এই বেলা মুচি ডেকে সেলাই করা।
৪। মা	৪। তুমি আমাকে যত্ন করেছ, তাই আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।
৫। মাস্টারমশাই	৫। বড়ো অন্যায়, বড়ো অন্যায়। শিগগির সেলাই করো।

৭. **গল্প থেকে অন্তত পাঁচটি ঘটনা খুঁজে নাও এবং সেইসব ঘটনার কারণ পাশাপাশি লেখো :**

ঘটনা	কারণ

৮. একই শব্দ পাশাপাশি বসেছে — এরকম যতগুলি পারো শব্দজোড়া গল্প থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো। একটি করে দেওয়া হলো : জোরে জোরে।

৯. **নীচের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লিখে তা দিয়ে বাক্য রচনা করো :**

সাহস, দুষ্টু, যত্ন, নামা, আরম্ভ, সম্ভব, কষ্ট, মন্দ, দুর্বল।

শব্দার্থ : জোড়াতাড়া — গোঁজামিল। উৎপাত — উপদ্রব, দৌরাত্ম্য। ঘন্ট — ঘেঁটে ফেলা, এলোমেলো করা। শ্রান্ত — ক্লান্ত। ভোগানি — কষ্ট পাওয়া। স্ফূর্তি — আনন্দ।

১০. **বর্ণ বিশ্লেষণ করো :** সেলাই, চৌকাঠ, সমস্ত, মাতব্বর, মুশকিল।

১১. 'যতীনের জুতো' গল্পের যে কোনো একটি অংশ বেছে নিয়ে সেটির ছবি আঁকো।

১২. **গল্প থেকে উপযুক্ত শব্দ সংগ্রহ করে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

১২.১ ______ জোরে কখনই এ বিদ্রোহ দমন করা যাবে না।

১২.২ আমরা গত ছুটিতে সবুজ ______ পিকনিক করতে গিয়েছিলাম।

১২.৩ ______ না করলে অন্যায় করা বেড়ে যায়।

১২.৪ গ্রীষ্মের দুপুরে রঙিন ______ চোখে দিলে আরাম বোধ হয়।

১২.৫ ______ দিঘার সমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে।

১৩. ‘ক’ স্তম্ভের সঙ্গে সংগতি রেখে ‘খ’ স্তম্ভে বাক্য লেখো :

ক	খ
১। দুরদুর	
২। সাঁইসাঁই	
৩। বোঁ বোঁ	
৪। মচমচ	
৫। টনটন	
৬। ফিসফিস	

১৪. নীচের শব্দগুলো থেকে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণ আলাদা করো :

শব্দ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ
১। ধুতি		
২। খুব		
৩। ছোটো		
৪। কাজে		

১৫. গল্পটি পড়ে আমরা যা শিখলাম তার অন্তত তিনটি বিষয় তোমার নিজের ভাষায় লেখো।
(একটি নমুনা দেওয়া হলো।)

১. সব জিনিসই যত্ন নিয়ে ব্যবহার করতে হয়।

২.

৩.

৪.

১৬. নীচের সূত্র অনুযায়ী শব্দছকটি পূরণ করো :

১.		২.			৩.			৪.
		৫.		৬.				
৭.								
			৮.		৯.			
১০.	১১.				১২.			
				১৩.				
			১৪.			১৫.	১৬.	
১৭.		১৮.						
১৯.					২০.			

পাশাপাশি

৩। ______ পাড়ানি মাসিপিসি
৫। শিগগির
৭। ______ পত্র
১০। যা দিয়ে লেখা যায়
১২। লাফ দিয়ে
১৩। যার উপর চক পেনসিল দিয়ে লেখা হয়
১৫। ভয়হীনতা
১৮। শিশুদের এতেই আনন্দ
১৯। গৃহ
২০। হাওয়া (সমার্থক শব্দ)

উপর-নীচ

১। যে জামাকাপড় বানায়
২। হাওয়া (সমার্থক শব্দ)
৩। ছেলেরা যা আকাশে ওড়ায়
৪। ব্যথায় পা ______ করছে
৬। জামাকাপড় ছিঁড়ে গেলে এটা দেখা যায়
৮। বিদ্যালয়
৯। বইয়ের জামা
১১। নব
১৪। সূঁচ-সুতো দিয়ে যা করা হয়
১৬। সহসা
১৭। পিতা

সমাধান : পাশাপাশি— ১. ঘুম ৫. তাড়াতাড়ি ৭. জিনিস ১০. পেনসিল ১২. লাফিয়ে ১৩. স্লেট ১৫. সাহস ১৮. খেলা ১৯. বাড়ি ২০. মরুৎ।
উপর-নীচ— ১. দরজি ২. বাতাস ৩. ঘুড়ি ৪. টনটন ৬. তাপ্পি ৮. স্কুল ৯. মলাট ১১. নতুন ১৪. সেলাই ১৬. হঠাৎ ১৭. বাবা।

১৭. ঘুড়ির সাহায্য না পেলে যতীন কোন পথে বাড়ি ফিরত —সেই পথটি বের করো :

মিলিয়ে পড়ো

সুকুমার রায়ের গল্প পড়লে। এর আগে পড়েছ সুকুমার রায়ের কবিতা। এখানে রইল তাঁরই লেখা একটি সরস রচনা। তোমরা বিদ্যালয়ে এই খেলার চর্চা করতে পারো।

হেঁয়ালি-নাট্য

সুকুমার রায়

ইংরাজিতে একরকম খেলা আছে, তাকে বলে, 'শ্যারাড' (Charade)। এ খেলা দেখতে হলে এমন কয়েকটি লোক দরকার যারা অন্তত একটু-আধটু অভিনয় করতে পারে। তারপর এমন একটি কথা নিয়ে অভিনয় করতে হবে, যাকে ভাগ করলে দু-তিনটা কথা হয়, যেমন Handsome (Hand ও Some বা Sum) অথবা Carpet (Car বা Cur ও pet)। অভিনয়ের প্রথম দৃশ্যে কথার প্রথম অংশটি, দ্বিতীয় দৃশ্যে দ্বিতীয় অংশটি, তৃতীয় দৃশ্যে সমস্ত কথাটি বুঝিয়ে দিতে হবে; যাঁরা দর্শক থাকবেন তাঁরা সব দেখেশুনে বলবেন, কোন কথাটি নিয়ে অভিনয় করা হলো। যদি কোনো কথার তিনটি অংশ থাকে—যেমন হাঁস পা-তাল, তা হলে অবশ্য চারটি দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে। বাংলাতেও 'শ্যারাড' বা 'হেঁয়ালি নাট্য' হতে পারে; একটা বাংলা দৃষ্টান্ত দিলে বোধহয় কথাটা পরিষ্কার হয়। মনে করো 'বৈঠক' কথাটা নিয়ে অভিনয় হচ্ছে।

প্রথম দৃশ্য—‘বই’। একজন লোক দিনরাত খালি বই নিয়ে ব্যস্ত, কেবলই বই পড়ছে। তার চারিদিকে রাশি রাশি বই ছড়ানো রয়েছে দেখে বিরক্ত হয়ে বলছে, ‘তোমার ও পোড়া বইগুলো একটু রাখো দেখি। চলো একটু হাওয়া খেয়ে একবার নরুবাবুর বৈঠকে যাই’। লোকটি অগত্যা রাজি হয়ে বলল, ‘আচ্ছা, তোমরা এগোও, আমি এইটা শেষ করেই আসছি।’

দ্বিতীয় দৃশ্য—‘ঠক’। একটি ছোট্ট বইয়ের দোকান, তার সামনে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক বইওয়ালাকে ভীষণ গালাগালি দিচ্ছেন। বলছেন, ‘চোর বাটপাড় ঠক জোচ্চোর, আগাম টাকাটা নিয়ে এখন বই দেওয়ার বেলায় ফাঁকি দিচ্ছ।’ বইওয়ালা বলে, ‘সে কী মশাই! কার কাছে টাকা দিলেন?’ ভদ্রলোক চটেমটে খুব খানিক শাসিয়ে চলে গেলেন। এমন সময়ে সেই বই-পড়া লোকটি এসেছে; বইওয়ালা তাকে একটি বহুকালের পুরোনো পুঁথি দেখাল—তার অনেক দাম! লোকটি বইখানা কিনে বলল, ‘বইটা একটু কাগজে জড়িয়ে বেঁধে দাও তো।’ বইওয়ালা ‘দিচ্ছি’ বলে বইখানা নিয়ে তার বদলে কতগুলো বাজে বটতলার বই বেঁধে দিয়ে বলল, ‘এই নিন মশাই।’ বই-পড়া লোকটি তখন হাঁ করে অন্য বই দেখছিল, সে কিছুই টের পেল না, বইয়ের প্যাকেট নিয়ে চলে গেল।

তৃতীয় দৃশ্য — ‘বৈঠক’। নরুবাবুর বৈঠকে বসে বন্ধুরা বলাবলি করছে, ‘আরে, অমুক কী আমাদের বৈঠক একেবারে ছেড়ে দিলে নাকি?’ একজন বলল, ‘না, সে আজ আসবে বলেছে।’

এমন সময় বই হাতে সেই লোকটির প্রবেশ। সকালের মহা উৎসাহ! একজন বলল, ‘এত দেরি হলো যে?’ ‘আর ভাই, পথে একটা কেতাব কিনতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল’—বলেই বইয়ের ব্যাখ্যা আর প্রশংসা। সকলে দেখতে চাইল, আর কাগজের মোড়ক খুলতেই বেরোল কতগুলো ছেঁড়া নোংরা বটতলার বই। ভদ্রলোক অপ্রস্তুত—সকলের হাস্যকৌতুক—ইত্যাদি।

হেঁয়ালি অভিনয় করতে হলে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হয়।

১. যে দৃশ্যে যে কথার অভিনয় হচ্ছে তাতে অন্তত একবার সেই কথাটা বলা দরকার! তা বলে বারবার বেশি স্পষ্ট করে বলাটাও ঠিক নয়।

২. যে কথাটার অভিনয় হচ্ছে তার সঙ্গে কিছু অন্য কথা আর অবান্তর অভিনয়ও কিছু কিছু থাকা দরকার। না হলে কথাটা নেহাত সহজে ধরা পড়ে যেতে পারে।

৩. দৃশ্যগুলি বেশি বড়ো না হয়। ছোটো-ছোটো তিনটি দৃশ্য হলেই ভালো।

হেঁয়ালি-নাট্যের উপযোগী কথা বাংলায় অনেক আছে; যেমন—‘জলপান’ (জল + পান), ‘বন্ধন’ (বন + ধন), ‘কারখানা’ (কার + খানা), ‘আকবর’ (আক + বর), ‘বৈকাল’ (বই + কাল), ‘যমালয়’ (জমা + লয়) ইত্যাদি।

আর-একরকমের হেঁয়ালি অভিনয় আছে, তাকে বলে Dumb Charade অর্থাৎ বোবা শ্যারাড। সে খেলায় কথা বলে না, শুধু বায়োস্কোপের মতো হাত-পা নেড়ে কথাগুলোর অভিনয় করে।

অজিত দত্ত

পঁ্যাচ কিছু জানা আছে কুস্তির ?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির ?
নইলে
রইলে
ট্রাম না চড়ে,
ভ্যাবাচ্যাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে।

প্র্যাকটিস করেছ কি দৌড়ে ?
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, আর ভোঁ-উড়ে ?
নইলে
রইলে
লরিতে চাপা,
তাড়া করে বাড়ি থেকে বাড়িও না পা।

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস ?
নইলে
রইলে
ভাত না খেয়ে
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

স্থির করে পা দুটো ও মনটা,
দাঁড়াতে পারো তো বারো ঘণ্টা ?
নইলে
রইলে
না কিনে ধুতি
যতই দোকানে গিয়ে করো কাকুতি।

হাতে কলমে

অজিত দত্ত (১৯০৭—১৯৭৯) : সাময়িক সাহিত্যপত্র *প্রগতি*-র যুগ্মসম্পাদক ছিলেন। চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট রচনা করে অজিত দত্ত যথার্থ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শুধুমাত্র কবিতা নয়, ছড়া রচনার ক্ষেত্রেও কবির অনায়াস দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সহজ, সরল ভাষা ও ভাবে নির্মিত ছড়াগুলি শিশুদের কাছে পরম আদরের। তাঁর রচিত বইগুলি হলো — *কুসুমের মাস, পাতালকন্যা, নষ্টচাঁদ, ছড়ার বই, ছায়ার আলপনা, জানালা* ইত্যাদি। কবির নিজের ভাষায় 'চলতি পথের ছন্দে লেখা/নতুন দিনের ছড়া' প্রধানত শিশুদের জন্য রচিত। কবি কখনও কখনও রূপকথার জগৎ, আবার কখনও বা বাস্তব জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে শিশুদের উপযোগী ছড়া তৈরি করেছেন।

১. কবি অজিত দত্ত কোন বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

২. তাঁর লেখা দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

৩. **নীচের এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো:**

চা বা কা ভ্যা, বু ম ত জ, ধি আ ধা আ, ন দো কা

শব্দার্থ : প্যাঁচ — কৌশল। ভ্যাবাচাকা — হতবুদ্ধি। বেঘোরে — সংকটে পড়া। প্র্যাকটিস — অভ্যাস। ভোঁ-উড়ে — দ্রুত উড়ে যাওয়ার ভঙ্গি। কাকুতি — অনুনয়, মিনতি।

'না কিনে ধুতি' — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছে এবং তার পরেও দীর্ঘকাল কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পোশাকের আকাল দেখা দিয়েছিল। সেই সময় সরকারি দোকানে নির্দিষ্ট মূল্যে ধুতি-শাড়ি বিক্রি হতো। সেই দোকানগুলিকে সাধারণভাবে *কন্ট্রোলের দোকান* বলা হতো। দীর্ঘ লাইন দিয়ে তবে ধুতি-শাড়ি কেনা যেত। কবিতার শেষ অংশে সেই দুর্ভোগের কথা আছে।

৪. কথা বলার সময় মূল শব্দ কখনও তার চেহারা বদলে ফেলে। যেমন কবিতায় রয়েছে 'নইলে' 'অভ্যেস' 'আধাআধি' ইত্যাদি শব্দ। এদের পাশাপাশি শব্দগুলির প্রকৃত রূপটি লেখো। আরো কিছু শব্দ তুমি খুঁজে নিয়ে লেখো।

৫. **কবিতা থেকে বিশেষণ শব্দগুলিকে খুঁজে নিয়ে বাক্যরচনা করো :** যেমন — সুস্থির, ভ্যাবাচাকা, মজবুত।

৬. **শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য দেখাও :**

চাপা/চাঁপা; চড়ে/ চরে; পড়ে/পরে; বাড়ি/বারি; তাড়া/তারা

৭. **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

৭.১ ভাত খাওয়ার প্রসঙ্গে কবি পাথর চিবানোর অভ্যেস আছে কিনা তা জানতে চেয়েছেন কেন?

৭.২ 'অপেক্ষা' 'তাড়াহুড়ো', 'দ্রুত গতি' ও 'শারীরিক দক্ষতা'— এই শব্দগুলি তোমার পঠিত কবিতাটিরকোন কোন স্তবকের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত তা শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নাও।

৭.৩ রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে গেলে নিজেকে কীভাবে প্রস্তুত করতে হবে?

৭.৪ বাড়ির বাইরের পৃথিবীতে মানিয়ে চলবার জন্য তুমি নিজেকে কীভাবে প্রস্তুত করবে?

৭.৫ এই কবিতাটি পড়ে যে যে ছবিগুলি তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই ছবিগুলি খাতায় এঁকে ফেলো।

৮. **প্রতিশব্দ লেখো :** মজবুত, ভাত, চাল, পা

৯. **বর্ণবিশ্লেষণ করো :** রাস্তা, কুস্তি, মজবুত, কাকুতি

১০. **অর্থ লেখো :** প্যাঁচ, কুস্তি, প্র্যাকটিস, ভ্যাবাচাকা, সুস্থির

১১. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো :** কিছু, সুস্থির, অভ্যেস, আধাআধি, মজবুত।

১২. 'চাল' ও 'বেশ' শব্দদুটিকে আলাদা আলাদা অর্থে ব্যবহার করে বাক্যরচনা করো।

১৩. কবিতায় তুমি কয়টি প্রশ্নবোধক বাক্য খুঁজে পেলে লেখো।

জেনে রাখো :

কলকাতা শহর ও ট্রাম — ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকতায় প্রথম ট্রাম চলে। তবে নিয়মিতভাবে ট্রাম চলাচল শুরু করে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। প্রথমে ট্রাম চলত ঘোড়ায়। ঘোড়ার বদলে পরীক্ষামূলকভাবে ১৮৮২ সালে ১১ মাস বাষ্পের ইঞ্জিন দিয়েও ট্রাম চালানো হয়েছে। তারপরে ১৯০২ সাল থেকে বৈদ্যুতিক ট্রামের চলা শুরু। (প্রসঙ্গ সূত্র : *কলের শহর কলকাতা*—সিদ্ধার্থ ঘোষ)

১৪. **শূন্যস্থান পূরণ করো :**

১৪.১ যেখানে কুস্তিগিরেরা অভ্যাস/শরীরচর্চা করেন, সেই জায়গাটিকে বলা হয় ______ ।

১৪.২ বাংলার একজন বিখ্যাত কুস্তিগির হলেন ______ ।

১৪.৩ ট্রাম ছাড়া একটি পরিবেশ-বান্ধব যান হলো ______ ।

১৪.৪ 'প্র্যাকটিস' শব্দটির অর্থ হলো ______ ।

১৪.৫ মন বলতে বোঝানো হয়ে থাকে ______ কে।

১৫. **বাক্য সম্পূর্ণ করো :**

১৫.১ ট্রামে চড়তে অসুবিধা হবে, যদি ______ ।

১৫.২ বাড়ি থেকে বেরোনোই মুশকিল, যদি ______ ।

১৫.৩ ভাত খাওয়া দুষ্কর হবে, যদি ______ ।

১৫.৪ দোকানে গিয়ে দাঁড়িয়েই থাকতে হবে, যদি ______ ।

১৫.৫ সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলা যাবে না, যদি ______ ।

ঘুমপাড়ানি ছড়া

স্বপনবুড়ো

ঘুমে যদি ঢুলেই আসে নয়ন দুটি—
সাঁঝের ফুল আর কে কুড়োবে মুঠি-মুঠি?
ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি
ওই যে দিয়ে দাঁতে মিশি
ঘুমের কাজল বুলিয়ে আসে গুটি গুটি।
ঘুমিয়ে পড়ে খেলাঘরের পুতুল যত—
রাত বাড়ে, আর ঝিঁঝিঁর ছড়া শুনবে কত?
চাঁদ যে ঝিমায় আকাশ কোণে
সন্ধ্যাতারা স্বপন বোনে—
শেষ ছড়া মোর ছড়িয়ে দিলাম নে না লুটি।
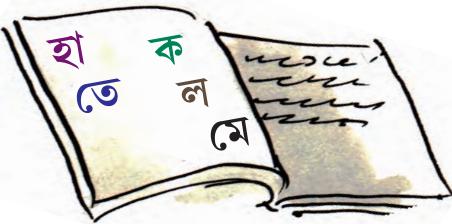
স্বপনবুড়ো (১৯০২—১৯৯৩) : স্বপনবুড়ো ছদ্মনামে লিখতেন অখিলবন্ধু নিয়োগী। ছাত্রাবস্থাতেই *শিশুসাথী* পত্রিকায় *বেপরোয়া* নামক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। শিশু ও কিশোরদের জন্য অজস্র ছড়া, কবিতা, গল্প, নাটক ও গান লিখেছেন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলি হলো *ধন্যি ছেলে*, *ভুতুড়ে দেশ*, *বাবুই বাসা বোর্ডিং*, *বাস্তুহারা* প্রভৃতি। তিনি *যুগান্তর* পত্রিকায় *ছোটোদের পাততাড়ি* সম্পাদনা করতেন। ছোটোদের নিয়ে *সব পেয়েছির আসর* গড়ে তুলেছিলেন।

১. অখিল নিয়োগী শিশুদের কাছে কী নামে পরিচিত ?

২. তাঁর লেখা একটি বইয়ের নাম লেখো।

৩. **ঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :** কা__ল, স__তা, __পন, __তুল, খে_র।

৪. **কবিতাটি পড়ে কত জোড়া অন্ত্যমিল খুঁজে পেয়েছ লেখো :**

যেমন— নয়ন দুটি }
মুঠি মুঠি }

৫. কবিতায় ‘মিশি’ শব্দটি একটি দ্রব্যের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটিকে ক্রিয়াপদ হিসাবে ব্যবহার করে তুমি কতগুলো অর্থে প্রয়োগ করতে পারো লেখো।

৬. **আমরা আমাদের প্রতিদিনের কথাবার্তায় এরকম শব্দবন্ধ ব্যবহার করে থাকি ।** যেমন —

দুধের সর   গাছের পাতা   পুকুরের জল

তোমরা এরকম আরও কয়েকটি শব্দবন্ধ যা আমরা প্রতিদিনের কথাবার্তায় ব্যবহার করে থাকি, লেখো।

__________   __________ ।

৭. **পরের পঙ্‌ক্তিটি লেখো :**

ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসি   ঘুমিয়ে পড়ে খেলাঘরের পুতুল যত   চাঁদ যে ঝিমায় আকাশ কোণে

__________   __________   __________

৮. ‘ছড়া’ শব্দটি কবিতায় ‘পদ্য’ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই অর্থ ছাড়া ‘ছড়া’ শব্দটি তুমি আর কী কী অর্থে ব্যবহার করতে পারো, বাক্যে প্রয়োগ করে দেখাও।

মায়াদ্বীপ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় আমরা মামাবাড়ি যেতাম নৌকোয় চেপে। কী যে ভালো লাগত! গাড়ি কিংবা ট্রেন কিংবা এরোপ্লেনের চেয়েও নৌকোয় যাওয়া অনেক আরামের। জলের শব্দ শুনতে শুনতে ঘুম ঘুম ভাব আসে, তাতে অনেক স্বপ্ন দেখা যায়।

আমাদের মামাবাড়িতে অবশ্য নৌকোয় ছাড়া অন্য কিছুতে যাওয়ার উপায়ও ছিল না। রাস্তা-টাস্তা জলেই ডুবে থাকত প্রায় সারা বছর। তাই প্রত্যেক বাড়িতে থাকত নিজস্ব নৌকো।

আমাদের বাড়ি থেকে নদীর ঘাট পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। সে নদীটা ছোটো, কিন্তু ঘাটের পাশে বাজার বলে সেখানে সবসময় অনেক নৌকোর ভিড়।

আমাদের নিজেদের নৌকোটা ছোটো, সেই নৌকোয় চেপে আমরা স্কুলে যেতাম। সে নৌকোয় বড়ো নদীতে যাওয়া যায় না। তাই আমাদের জন্য মামাবাড়ি থেকে আসত একটা বড়ো নৌকো, তাতে হলুদ রঙের পাল। সে নৌকোর তিনজন মাঝির মধ্যে হেড-মাঝির নাম নাদের আলি, সে কতরকমের গল্প শোনাত আমাদের।

ছোটো নদীটা খানিক দূর গিয়ে একটা বড়ো নদীতে মিশেছে। সে নদীটার নামও খুব মিষ্টি, বাতাসি। খুব একটা বড়ো নয়, দু-দিকের পাড় দেখা যায়। কতরকমের মানুষ, কত পুরোনো গাছ, আর মন্দির, মসজিদ, জমিদারদের বাড়ি। এক জায়গায় শ্মশান, সেখানেও ঘাট বাঁধানো।

এই বাতাসি নদী আবার খানিকটা পরে আরও বড়ো একটা নদীতে এসে পড়ত। সে নদীর নাম পিংলা। কতক্ষণে পিংলা নদী আসবে তার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতাম।

এই পিংলা নদীতে দেখা যেত শুশুক। ইংরেজিতে যাদের বলে ডলফিন। হঠাৎ হঠাৎ হুস করে মাথা তুলেই আবার ডুবে যায় জলে। অনেকটা যেন মানুষের মতন। খুব ছেলেবেলায় আমার মনে হতো জলের নীচে নিশ্চয়ই অনেক মানুষ থাকে। একটু বড়ো হয়ে শুশুক চিনতে শিখেছি।

আমরা চোখ বড়ো করে তাকিয়ে থাকি নদীর দিকে, কখন শুশুক দেখা যাবে। দেখলেই চেঁচিয়ে উঠি। কে-কটা দেখলাম, তাই গুনি। এই নিয়ে প্রতিযোগিতা হতো, প্রত্যেকবারই জিতে যেত আমার ছোটোকাকা। আমি পাঁচটা শুশুক দেখলে ছোটোকাকা দেখত এগারোটা। কিন্তু ছোটোকাকার কথায় আমাদের সবসময় সন্দেহ থেকে যেত। আমি ডানদিকে তাকিয়ে আছি, ছোটোকাকা বাঁদিকে আঙুল তুলে বলে, 'ওই যে, ওই যে একটা।' আমি সেদিকে ফিরে আর দেখতে পাই না।

সবচেয়ে কম দেখতে পান মা। আমরা চেঁচিয়ে উঠলেই মা বলেন, 'কই রে, কই রে? যাঃ, চশমাটা কোথায় গেল?' মা চশমা পরা পর্যন্ত কি শুশুকরা জলের উপর মাথা তুলে বসে থাকবে?

সেবারে মা কোনোক্রমে দেখতে পেলেন একটা মাত্র!

পিংলা নদী দিয়ে একঘণ্টা নৌকো বেয়ে যাওয়ার পর দেখা যেত একটা দ্বীপ। নদীর মধ্যেও যে দ্বীপ থাকে, তা অনেকেই জানে না। এখানে নদী দু-ভাগ হয়ে গেছে, দ্বীপের দু-পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে।

সে দ্বীপে কোনো বাড়ি-ঘর নেই, তবে অনেক গাছ আছে। খুব বড়ো গাছ নয়, ঝোপের মতো, একটা শুধু বড়ো শিমুল গাছ অনেক দূর থেকে দেখা যায়।

আমি নাদের আলিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'নাদের দাদা, ওই দ্বীপটার নাম কী?'

নাদের আলির মাথায় ঝাঁকড়া, ঝাঁকড়া চুল, গালে কাঁচাপাকা দাড়ি। সবসময় তার ঠোঁটে হাসি লেগে থাকে। সে বলল, 'এমনিতে তো কিছু নাম নাই, তবে আমরা বলি মায়াদ্বীপ।'

ছোটোকাকা বলল, 'ভালো নাম দিয়েছ। মায়াদ্বীপই বটে। মাঝে-মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায়।'

সে কথা শুনে আমার প্রথম মনে হলো, দ্বীপটা কী আকাশে উড়ে যায় নাকি?

তা অবশ্য নয়। যে বছর খুব বৃষ্টি কিংবা বন্যা হয়, সে বছর দ্বীপটা চলে যায় জলের তলায়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'জলে ডুবে যায়? এত যে গাছ রয়েছে, সেগুলোর কী হয়?'

নাদের আলি বলল, ‘এইসব গাছ পানির মধ্যেও অনেকদিন বেঁচে থাকে। দ্বীপটা যখন আবার জেগে ওঠে, তখন দেখা যায় অনেক গাছই ঠিকঠাক আছে।’

ছোটোকাকা বলল, ‘শুধু মাথা উঁচু করে থাকে শিমুল গাছটা। তখন তো দু-দিকের নদী এক হয়ে যায়, শুধু যেন মাঝনদীতে দাঁড়িয়ে থাকে একটা লম্বা গাছ।’

আমার খুব ইচ্ছে করত, একবার সেই দ্বীপটায় নামতে। পুরো দ্বীপটাই যেন একটা বাগান।

ছোটোকাকা বলল,‘না, না, ওখানে নামা যাবে না। প্রচুর সাপ, একেবারে কিলবিল করছে।’

কথাটা আমার বিশ্বাস হলো না।

নাদের আলিকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘সত্যিই ওখানে সাপ আছে?’

নাদের আলি বলল, ‘সে দুটো-একটা থাকতে পারে। কিন্তু ও দ্বীপে পা দিতে নাই। মায়াদ্বীপে ওনারা থাকেন!’

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ‘ওনারা মানে কারা?’

সে কথার উত্তর না দিয়ে নাদের আলি দু-দিকে মাথা দোলাল। তারপর হঠাৎ দাঁড় বাইবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সেবারে বর্ষাকালে পিংলা নদীতে আমরা দেখেছিলাম মোট সাতটা শুশুক, আর একটা কুমির!

আরও খানিক পরে এল মায়াদ্বীপ। এই দ্বীপের কাছে এলেই বোঝা যায়, আর দেড় ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব মামাবাড়ি।

সেবারে অনেক ফুল ফুটেছে, এমনকী শিমুল গাছটাও ফুলে ভরতি। ছোটোকাকা আরও শুশুক খুঁজছে, আমি তাকিয়ে আছি দ্বীপটার দিকে।

হঠাৎ চমকে উঠে বললাম, 'ওই তো মায়াদ্বীপে মানুষ নেমেছে!'

ছোটোকাকা বলল, 'কোথায় রে?'

আমি আঙুল তুলে দেখালাম। কয়েকটা ঝোপের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। বড়ো জোর তেরো-চোদ্দো বছর বয়স। ফরসা রং, কোঁকড়া চুল, সে ফুলগাছে হাত বুলোচ্ছে, কিন্তু ফুল ছিঁড়ছে না।

ছোটোকাকা বলল, 'তাইতো, একা একটা মেয়ে ওখানে গেল কী করে? সঙ্গে কেউ নেই?'

নাদের আলি কেমন যেন ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, 'ওদিকে তাকিও না, তাকিও না, চক্ষু বুজে ফেলো!'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন, ওদিকে দেখব না কেন?'

নাদের আলি নিজে চোখ বুজিয়ে বলল, 'ওনাদের দেখতে নাই।'

অন্য দুজন মাঝিও চোখ বুজে ফেলেছে।

ছোটোকাকা বলল, 'বুঝেছি, মারমেড! জলকন্যা! দেখছিস না, ও মেয়েটার কোমরের দিকটা দেখা যাচ্ছে না।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'মারমেডদের দেখলে কী হয়?'

ছোটোকাকা বলল, 'আমাদের কিচ্ছু হবে না। ওদের কষ্ট হয়। মানুষের দৃষ্টি ওরা সহ্য করতে পারে না।'

মা বললেন, 'তোরা কী দেখেছিস? কই, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যাঃ চমশাটা কোথায় গেল!'

মা সবসময় চশমা পরে থাকেন না। আর দরকারের সময় চশমা খুঁজে পান না। চোখ বোজা অবস্থাতেই মাঝিরা জোরে জোরে চালিয়ে দ্বীপটি পার হয়ে গেল। নাদের আলি আবার চোখ খোলার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'নাদেরদা, ও মেয়েটি কি সত্যিই জলকন্যা? তুমি আগেও দেখেছ?'

নাদের আলি বলল, 'আমি তো কখনও দেখি নাই।'

আমি বললাম, 'এই যে একটু আগে দেখলে?'

নাদের আলি দু-দিকে মাথা দুলিয়ে বলল, 'না তো, আমি কিছু দেখি নাই!'

মামাবাড়িতে পৌঁছেই আমি রাঙামাসিকে বললাম, 'জানো, আজ কী হয়েছে? আমরা মারমেড দেখেছি। জলকন্যা!'

রাঙামাসি বললেন, 'আবার গুল ঝাড়তে শুরু করেছিস? এই নীলুটাকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

আমার তখন উত্তেজনায় ফেটে পড়ার মতন অবস্থা। আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'না গুল নয়। সত্যি সত্যি মায়াদ্বীপে দেখেছি। ঠিক মানুষের মতো!'

রাঙামাসি বললেন, 'মায়াদ্বীপ আবার কী? ওই নদীর মধ্যে বানভাসি দ্বীপটা? ওখানে কোনো মানুষ যায় না, কখন ডুবে যাবে তার ঠিক নেই!'

আমি বললাম, 'মানুষ নয়, জলকন্যা। আদ্ধেকটা মানুষের মতন। তুমি ছোটোকাকাকে জিজ্ঞেস করো।'

ছোটোকাকা যে এমন বিশ্বাসঘাতক তা আমি জানতাম না।

ছোটোকাকা অম্লান বদনে বলল, 'দূর, মারমেড বলে কিছু আছে নাকি? আমি কিছুই দেখিনি। নীলু বোধহয় একটা কলাগাছ দেখে ভেবেছে—'

আমি প্রবল প্রতিবাদ করে বলতে গেলাম যে সে দ্বীপে মোটেও কোনো কলাগাছ ছিল না। মেয়েটির মুখ স্পষ্ট দেখেছি। কিন্তু অন্য সবাই হাসতে হাসতে আমায় আর কিছু বলতেই দিল না।

আমার আজও দৃঢ় বিশ্বাস আমি একটি জলকন্যাকেই দেখেছি। সে একবার আমাদের দিকে তাকিয়েছিল। হিরের টুকরোর মতন জ্বলজ্বলে তার চোখ। ওরকম চোখ মানুষের হয় না!

শুনেছি, এখন দ্বীপ একেবারেই জলের তলায় চলে গেছে। এমনকী শিমুল গাছটাও আর নেই।

হাতে কলমে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) : বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কিশোর বয়সেই কলকাতায় আসেন। কলকাতার জীবন তাঁর লেখায় যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনই অনেক লেখাতে রয়েছে ওপার বাংলার স্মৃতি। *নীললোহিত* ছদ্মনামে অনেক বই লিখেছেন। অজস্র কবিতা, গল্প, উপন্যাসের রচয়িতা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কয়েকটি সংকলন/রচনাগ্রন্থ হলো — *কাকাবাবু সমগ্র, কিশোর অমনিবাস, গড় বন্দীপুরের কাহিনী, সপ্তম অভিযান, বিজনে নিজের সঙ্গে, আমাদের ছোটো নদী* প্রভৃতি। পাঠ্য রচনাটি তাঁর *বড়োরা যখন ছোটো ছিল* গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সৃষ্ট কাকাবাবু চরিত্রটির আসল নাম কী?

২. পাঠ্যরচনাটি তাঁর কোন বই থেকে নেওয়া?

৩. **সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ উত্তর দাও :**

৩.১ 'মায়াদ্বীপ' গল্পের কথকের নাম কী?

৩.২ কোন ঋতুতে তার মামাবাড়ি যাওয়ার পথের বর্ণনা গল্পে রয়েছে?

৩.৩ কথকের মামাবাড়ি যেতে হলে কোন কোন নদী পেরিয়ে যেতে হবে?

৩.৪ গল্পে উল্লিখিত বানভাসি দ্বীপটির নাম কী ছিল?

৩.৫ কথকের মায়ের অনেক শুশুক দেখা হয়ে ওঠে না কেন?

৩.৬ নাদের আলির চেহারার কিরূপ বিবরণ গল্পে রয়েছে?

৩.৭ পিংলা নদীর মাঝের সেই দ্বীপে সবচেয়ে লম্বা গাছটি কী ছিল?

৩.৮ ছোটোকাকা কথককে মারমেডদের সম্পর্কে কী জানিয়েছিল?

৩.৯ কথকের মামাবাড়িতে পৌঁছে ছোটোকাকা অম্লান বদনে কী বলেছিলেন?

৩.১০ মায়াদ্বীপের বর্তমান কোন পরিস্থিতির কথা গল্পে রয়েছে?

৩.১১ এই গল্পে কী কী গাছের নাম পেয়েছ তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

৪. **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :**

৪.১ গল্পকথকের কাছে গাড়ি, ট্রেন বা এরোপ্লেনের চেয়েও নৌকোয় যাওয়া অনেক আরামের মনে হয়েছে কেন?

৪.২ 'প্রত্যেক বাড়িতে থাকত নিজস্ব নৌকো।'— এমন বন্দোবস্তের কারণ কী ছিল?

৪.৩ 'সেখানে সবসময় অনেক নৌকোর ভিড়।' — কোন স্থানের কথা এখানে বলা হয়েছে?

৪.৪ গল্পকথকের মামাবাড়ি থেকে যে নৌকো তাঁদের নিতে আসত, সেটির কথা তিনি কীভাবে স্মরণ করেছেন?

৪.৫ 'বাতাসি' নদীতে নৌকো চড়ে যেতে যেতে আশপাশের কীরূপ দৃশ্য দেখা যেত?

৪.৬ 'কতক্ষণে পিংলা নদী আসবে তার জন আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম।' — এমনভাবে অপেক্ষা করার কারণ কী?

৪.৭ 'এই নিয়ে প্রতিযোগিতা হতো।' — কোন প্রতিযোগিতার কথা বলা হয়েছে?

৪.৮ লোকমুখে কোন দ্বীপটি 'মায়াদ্বীপ' নামে পরিচিত? তার এমন নামকরণের সম্ভাব্য কারণ বুঝিয়ে দাও।

৪.৯ 'মায়াদ্বীপে ওনারা থাকেন!' — কাদের প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে?

৪.১০ 'আমার আজও দৃঢ় বিশ্বাস' — কোন দৃঢ় বিশ্বাসের কথা কথক শুনিয়েছেন? ঘটনার এত বছর পরেও কোন ছবি তিনি ভুলতে পারেননি?

৪.১১ এই গল্পে কতজন মানুষের চরিত্র রয়েছে এবং গল্পে তারা কে কোন ভূমিকা পালন করেছেন তা পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে লেখো।

৪.১২ এই গল্পে মানুষ ছাড়া যে সকল প্রাণীর কথা রয়েছে তাদের নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ লেখো।

৫. **নীচের শব্দগুলির বর্ণবিশ্লেষণ করে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি কোনটি কোন বর্গের—তা ছক করে তার ঠিক ঠিক ঘরে বসাও :**

নদী, মাথা, মতন, অনেক, ছোটোকাকা, ডানদিক।

৬. তুমি কিছুটা রেলপথে, কিছুটা জলপথে এবং কিছুটা হাঁটাপথে কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলে। এই বেড়ানো তোমার কেমন লেগেছে তা তোমার ডায়ারির পাতায় দিনলিপির আকারে লেখো।

৭. **দুটি করে বাক্যে যুক্ত হয়ে নীচের বাক্যগুলি তৈরি হয়েছে। তুমি বাক্য দুটিকে আলাদা করে লেখো :**

৭.১ হঠাৎ হঠাৎ হুস করে মাথা তুলেই আবার ডুবে যায় জলে।

৭.২ নদীর মধ্যেও যে দ্বীপ থাকে, তা অনেকেই জানে না।

৭.৩ নাদের আলি আবার চোখ খোলার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম।

৮. 'মারমেড'-এর মতো অলৌকিক কিংবা বাস্তবে যাঁদের অস্তিত্ব নেই—যারা থাকে শুধু কল্পনায়—এমন কিছু উদাহরণ তুমি সংগ্রহ করে লেখো।

৯. **নীচের শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ও তা দিয়ে বাক্যরচনা করো :**

ঘুম, ভিড়, অধীর, হিংস্র, প্রবল, স্পষ্ট, দৃঢ়।

১০. সর্বনামের প্রয়োগ রয়েছে এমন পাঁচটি বাক্য গল্পটি থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।

১১. 'হেড-মাঝি' — শব্দবন্ধটিতে ইংরাজি ও বাংলা শব্দের সমন্বয় ঘটেছে। এমন পাঁচটি শব্দ তুমি তৈরি করো।

১২. **নীচের বাক্যগুলিতে বিশেষণ চিহ্নিত করো :**

১২.১ আমাদের জন্য মামাবাড়ি থেকে আসত একটা বড়ো নৌকো।

১২.২ সবচেয়ে কম দেখতে পান মা।

১২.৩ ভালো নাম দিয়েছে।

১২.৪ প্রচুর সাপ, একেবারে কিলবিল করছে।

১২.৫ শুধু মাথা উঁচু করে থাকে শিমুল গাছটা।

১২.৬ আমার আজও দৃঢ় বিশ্বাস আমি একটি জলকন্যাকেই দেখেছি।

১৩. **ঘটনাগুলির পাশাপাশি কারণ খুঁজে নিয়ে লেখো :**

১৩.১ মামাবাড়ি থেকে আসত একটা বড়ো নৌকো।

১৩.২ ছোটোকাকার কথায় আমাদের সবসময় সন্দেহ থেকে যেত।

১৩.৩ ছোটোকাকা বলল, 'না না, ওখানে নামা যাবে না।"

১৩.৪ নাদের আলিকে জিজ্ঞেস করলাম 'সত্যিই ওখানে সাপ আছে?'

১৩.৫ অন্য দুজন মাঝিও চোখ বুজে ফেলেছে।

১৪. **শব্দযুগলের অর্থপার্থক্য দেখাও :**

দ্বীপ/দীপ, অন্য/অন্ন, বান/বাণ, কাচা/কাঁচা, ভাল/ভালো, শাপ/সাপ

শব্দার্থ ও টীকা : বিশ্বাসঘাতকতা — বিশ্বাস ভাঙে যে, বেইমান। অম্লান — ম্লান নয় যা, অমলিন। দ্বীপ — চারিদিকে জলবেষ্টিত স্থল। শুশুক/ডলফিন — স্তন্যপায়ী জলজন্তু বিশেষ, সাধারণত সমুদ্রে বসবাস করে, কখনো কখনো স্রোতের ধাক্কায় নদীতে ঢুকে পড়ে, নিরীহ স্বভাবের প্রাণী। শোনা যায়, দিগভ্রান্ত জাহাজ ও নৌকার নাবিকদের পথ চিনতে সাহায্য করে। বহু গল্প, উপন্যাসে শুশুকের সহৃদয়তার কাহিনি প্রচলিত আছে। মারমেড — মারমেড অর্থাৎ জলকন্যাদের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। এদের সাধারণত সমুদ্রের নির্জন দ্বীপে দেখতে পাওয়া যায় বলেই জনশ্রুতি। জলকন্যাদের শরীরের ওপরের অংশ সুন্দরী নারীর হলেও নীচের অংশ মাছের মতো।। নাবিক ও মাঝিমাল্লাদের মুখে মুখে জলকন্যাদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ভালো-মন্দ দু-ধরনের কাল্পনিক গল্পই প্রচলিত আছে।

১৫. 'রাস্তা-টাস্তা' — শব্দবন্ধে প্রথম অংশে যেমন নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে, পরের অংশের তা নেই। তুমি এমন পাঁচটি শব্দবন্ধ তৈরি করো।

১৬. 'পাল' ও 'ঘাট' এই শব্দদুটিকে দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহার করে বাক্যরচনা করো।

১৭. **নীচের কোন বাক্যে কোন ভাব প্রকাশ পেয়েছে লেখো :**

(প্রশংসা/বিস্ময়/প্রশ্ন/নিষেধ/সংশয়)

১৭.১ কী যে ভালো লাগত!

১৭.২ সে নদীটার নামও খুব মিষ্টি, বাতাসি।

১৭.৩ অনেকটা যেন মানুষের মতো।

১৭.৪ যা চশমাটা কোথায় গেল?

১৭.৫ না, না ওখানে নামা যাবে না।

১৮. নীচে চারটি ছবি আছে। এই চারটি ছবিকে নিয়ে তুমি নিজের ভাষায় একটি অনুচ্ছেদ লেখো :
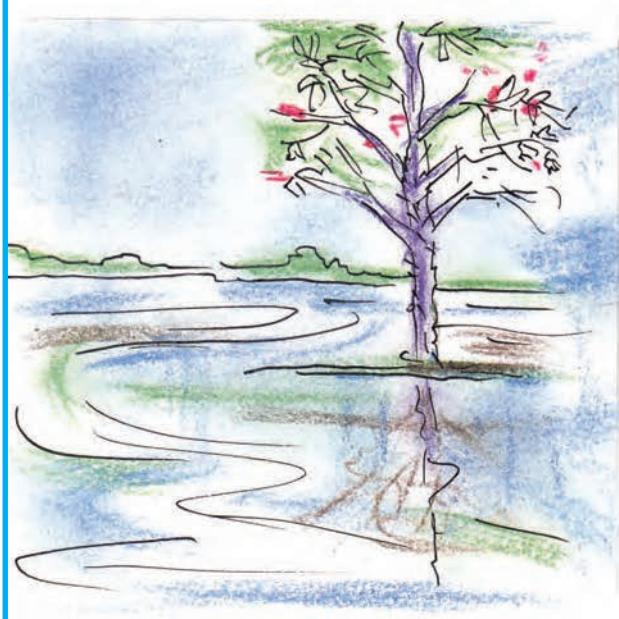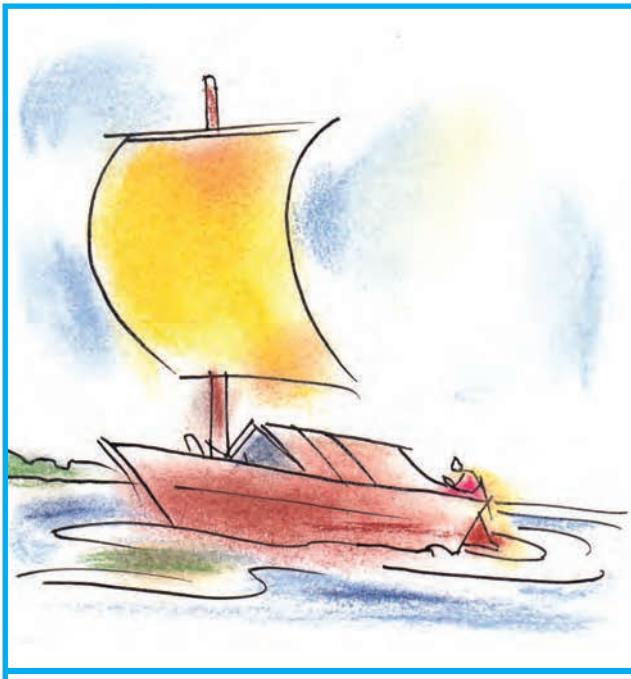
ঘুম-ভাঙানি

মোহিতলাল মজুমদার

ফুটফুটে জোছনায়
জেগে শুনি বিছনায়
বনে কারা গান গায়,
ঝিমি-ঝিমি ঝুম-ঝুম—
‘চাও কেন পিটি-পিটি ?
উঠে পড়ো লক্ষ্মীটি
চাঁদ চায় মিটিমিটি
বনভূমি নিঝঝুম !

ফাল্‌গুনে বনে বনে
পরিরা যে ফুল বোনে,
চলে এসো ভাই-বোনে,
চোখ কেন ঘুম-ঘুম?'
জানালায় মুখ দিয়ে
দেখি, সাদা জোছ্‌নায়,
পাতাগুলো হলো কী এ!
রুপোলিতে রোজ নায়!
'ওগো শোনো কান পেতে,
মোরা আছি গানে মেতে,
ছোটো ছোটো লন্ঠন
গায়ে গায়ে ঠন-ঠন,
ঝকমকে পল্টন—
আমোদের রোশনাই!
ঘোর ঘোর এই আলো—
আবছায়া বাসি ভালো,
ঘুরে উড়ে গান গাই
খুশদিল, হুঁশ নাই!'

চুপি চুপি ভয়ে ভয়ে
জোছ্‌নায় আবছায়,
যেই গেনু হেঁট হয়ে
জুতো মোজা দিয়ে পায়—
নিবে গেল রোশনাই,
পরিদের খোঁজ নাই,
কই গান? কই সুর?
শোনা যায় ফুরফুর
বাতাসের ঝুরঝুর
বাইরেটা ফ্যাকাশে!
ডানায় শিশির মাখি
এতখন শ্যামা পাখি
করছিল ডাকাডাকি,
—ভোর হয় আকাশে।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮—১৯৫২) : রবীন্দ্রনাথের সমসময়ে যাঁরা এক স্বতন্ত্র ধারার খোঁজে নতুন ধরনের কবিতা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবি মোহিতলাল মজুমদার। তাঁর আদিবাড়ি হুগলি জেলার বলাগড় গ্রামে। পিতার নাম নন্দলাল মজুমদার। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো *স্বপনপসারী*, *বিস্মরণী*, *স্মরগরল*, *হেমন্ত গোধূলি*, *ছন্দ চতুর্দশী* এবং প্রবন্ধগুলি হলো *আধুনিক বাংলা সাহিত্য*, *জীবন জিজ্ঞাসা*, *সাহিত্য বিচার* ইত্যাদি। কবি মোহিতলাল শেষ জীবনে কিছুদিন *বঙ্গদর্শন* (নবপর্যায়) ও *বঙ্গভারতী* নামক সাময়িকপত্র সম্পাদনা করেছিলেন।

১. মোহিতলাল মজুমদারের লেখা দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখো।

২. তাঁর সম্পাদিত দুটি পত্রিকার নাম লেখো।

৩. পূর্ণিমায় ফুট্‌ফুটে জোছনা যেমন, তেমনই ____ অন্ধকার, অমাবস্যায়।

৪. ‘পিটিপিটি’ ও ‘মিটিমিটি’ তাকানোর অর্থ হলো ____ ও ____।

৫. ‘লক্ষ্মীটি’ শব্দটি কবিতায় যে অর্থে ব্যবহার হয়েছে ____

৬. **কবিতায় কিছু শব্দ উচ্চারণে তার মূল চেহারা থেকে বদলে গেছে। বদলে যাওয়া চেহারার পাশাপাশি মূল শব্দগুলি লেখো :**

জোছনা —	বিছনা —	নিঝঝুম —
আবছায় —	নিবে —	শ্যামা-পাখি —

৭. **কবিতা থেকে ধ্বনাত্মক শব্দগুলি খুঁজে নিয়ে তা দিয়ে স্বাধীন বাক্য রচনা করো :**

৮. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৮.১ কবিতায় কোন ঋতুর কথা রয়েছে?

৮.২ গান গেয়ে কারা ডাকে?

৮.৩ জানালায় মুখ বাড়িয়ে বাইরে কী দেখা গেল?

৮.৪ পাতাগুলোকে রুপোলি লাগছে কেন?

৮.৫ ‘ওগো শোনো কান পেতে’— কান পাতলে কী শোনা যাবে?

৮.৬ ‘চুপি চুপি ভয়ে ভয়ে’ কবিতার কথক কোন কাজ করতে চায়?

৮.৭ তার উদ্দেশ্য সফল হলো কি?

৯. ‘ভিজে জবজবে-র মতো আর কোন কোন শব্দ পাশাপাশি পাতায় লিখতে পারো তা কবিতাটি থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো।

১০. নীচের পঙ্‌ক্তিগুলিতে ‘বনে’, বোনে’ ‘বোনে’ শব্দ তিনটি উচ্চারণে এক হলেও অর্থে আলাদা। এই তিনটি শব্দের অর্থ লেখো এবং তা দিয়ে বাক্য রচনা করো :

ফাল্গুনে বনে বনে
পরীরা যে ফুল বোনে
চলে এসো ভাই বোনে

শব্দার্থ : নায় --- স্নান করে। লণ্ঠন --- কাচ দিয়ে ঘেরা বাতিবিশেষ। পল্টন --- সৈন্যদল। আমোদের রোশনাই— আনন্দের আলো। খুশদিল — আনন্দিত হৃদয় বা মন। হুঁশ — জ্ঞান, চেতনা।

১১. গায়, চায়, বাসি, নায়, ঘোর, সুর — এই শব্দগুলিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করে আলাদা আলাদা বাক্য লেখো।

১২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১২.১ কবিতায় কথক রাত জেগে বাইরে কী দেখে?

১২.২ কবিতায় বর্ণিত বনভূমি নিঝঝুম কেন?

১২.৩ ‘মোরা আছি গানে মেতে’ — এখানে ‘মোরা’ বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে? তারা গান গেয়ে কী বলেছিল?

১২.৫ কথক চুপি চুপি জুতোমোজা পায়ে দিয়ে বাইরে যেতে কী ঘটনা ঘটল তা নিজের ভাষায় লেখো।

১২.৬ এমনই কোনো এক জ্যোৎস্না রাতে জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে তোমার বিছানায় পড়ছে। তোমার ঘুম আসছে না। এই জ্যোৎস্না রাতে তোমার নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তুমি কয়েকটি বাক্য লেখো।

শিখন পরামর্শ

- জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা -২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ নথি দুটিকে ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যপুস্তকটি (চতুর্থ শ্রেণির বাংলা) রূপায়িত হলো। বইটির পরিকল্পনায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে শ্রেণিশিখনের পূর্বে শিক্ষক/শিক্ষিকা সযত্নে পুরো বইটি পড়ে নেবেন।

- পাঠ্য এই বইটির ভাবমূল (Theme) 'রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ও খেলার জগৎ'। নানা ছড়ায়, কবিতায়, গানে, গল্পে, নাটকে তুলে ধরা হয়েছে দেশ-বিদেশের রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনি। প্রকৃতি-সংলগ্ন বিভিন্ন ধরনের মানুষের প্রসঙ্গ যেমন এসেছে তেমনই পল্লিবাংলার নদীর ধার, সবুজ অরণ্যানীর নিবিড় ছায়ায় ঢাকা মেঠো পথ ধরে শিশু-কিশোরের অভিযান, প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধুত্ব, উদার মাঠে-ঘাটে হই হই করে খেলে বেড়ানো ছোটোদের ছবি উঠে এসেছে এই বই-এর পাতায় পাতায়। প্রকৃতি-স্বদেশ-স্বাধীনতা বিষয়ক গান, মনীষী ও বিপ্লবীদের জীবনকথা, দুঃসাহসী মানুষের বিশ্বভ্রমণের অভিনব অভিজ্ঞতার অপূর্ব বিবরণ আর চারদেয়ালের সীমানা ছাড়িয়ে খোলা আকাশের নীচে খেলে বেড়ানো প্রাণচঞ্চল শিশুদের কলতানে সমৃদ্ধ এই বইটি।

- এই বইটির 'হাতে কলমে' অংশটি বিশদ এবং বিস্তৃত। কেননা এই 'হাতে কলমে' অংশটিতে CCE পুস্তিকার বিভিন্ন দিকনির্দেশগুলি অনুসৃত হয়েছে। প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের বিভিন্ন সূচক যেমন এই সমস্ত 'হাতে কলমে' অংশে ব্যবহার করা যাবে তেমনই পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যেরও প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ মুক্ত চিন্তা চর্চার পরিসর (Open Ended Learning Task), বিভিন্ন অর্জিত সামর্থ্যগুলি সম্পূর্ণ শিক্ষাবর্ষ জুড়ে চর্চার সুযোগ গড়ে উঠবে। শিক্ষিকা/শিক্ষকদের মূল্যায়ন বিষয়ে যাবতীয় অস্পষ্টতা দূর করতেই এই প্রয়াস। শিক্ষিকা/শিক্ষকেরা তাই চতুর্থ শ্রেণির বাংলা বইয়ের 'হাতে কলমে' অংশটি একটি নমুনা হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

শিক্ষাবর্ষে পাঠপরিকল্পনার সম্ভাব্য সময়সূচি ও পাঠক্রম :

মাসের নাম	পর্যায়	পাঠের নাম	মন্তব্য
জানুয়ারি	প্রথম পর্যায়	সবার আমি ছাত্র, নরহরি দাস, কোথাও আমার	প্রকৃতির শিক্ষা ও আত্মপ্রত্যয়।
ফেব্রুয়ারি	প্রথম পর্যায়	তোত্তো-চানের অ্যাডভেঞ্চার, বনভোজন, ছেলেবেলার দিনগুলি	বন্ধুত্ব, দলগত খেলা, মিলেমিশে থাকতে শেখা।
মার্চ	প্রথম পর্যায়	মালগাড়ি, বনের খবর (দু চাকায় দুনিয়া), বিচিত্র সাধ	রোমাঞ্চকর অভিযান ও মনের ইচ্ছা পূরণ।
এপ্রিল	দ্বিতীয় পর্যায়	আমাজনের জঙ্গলে (সত্যি চাওয়া), আমি সাগর পাড়ি দেবো, দক্ষিণমেরু অভিযান (বহু দিন ধরে),	দেশ-বিদেশে অভিযান ও অকুতোভয়তা ।
মে	দ্বিতীয় পর্যায়	আলো, বর্ষার প্রার্থনা	ভয়কে জয় করার শিক্ষা।
জুন ও জুলাই	দ্বিতীয় পর্যায়	অ্যাডভেঞ্চার বর্ষায়, খরবায়ু বয় বেগে, আমার মা-র বাপের বাড়ি (নদীপথে), দূরের পাল্লা	মাঠে ঘাটে খেলে বেড়ানোর আনন্দ ও শৈশবের রোমাঞ্চ।
আগস্ট	তৃতীয় পর্যায়	বাঘা যতীন, আদর্শ ছেলে, উঠো গো ভারতলক্ষ্মী	স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতার আনন্দ।
সেপ্টেম্বর	তৃতীয় পর্যায়	যতীনের জুতো (হেঁয়ালি নাট্য), নইলে	মজার খেয়াল।
অক্টোবর ও নভেম্বর	তৃতীয় পর্যায়	ঘুম পাড়ানি, মায়াদ্বীপ, ঘুম-ভাঙানি	কল্পনার আনন্দ।

* সুবিনয় রায়চৌধুরীর 'ছবির ধাঁধা' নামক অংশটি গোটা শিক্ষাবর্ষ জুড়ে আনন্দপাঠের অংশ হিসেবে শিক্ষিকা/শিক্ষকেরা ব্যবহার করবেন।